খবর সোজাসুজি
উৎসব সংখ্যা ২০২৫
সম্পাদক
ইসরাইল মল্লিক

ধনিয়াখালি পঞ্চায়েত সমিতি

উন্নয়নের সাথে উন্নয়নের পথে

আমাদের লক্ষ্য

- পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রচেষ্টায় সকলের জন্য শিক্ষা ও স্বাস্থ্য আন্দোলনের লক্ষ্যমাত্রাকে একশো ভাগ পূরণ করার জন্য আমরা অঙ্গিকার বদ্ধ।
- আমরা চাই বিশেষ মহিলা স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীগুলিকে সঠিক পরিচর্যার মাধ্যমে তাদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সামাজিক মর্যাদার মান উন্নয়নের পথ দেখাতে।
- খেলাধূলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে যুবদের উন্নয়নমুখী করার প্রচেষ্টাও আমাদের থাকবে।
- যুবশ্রী, কন্যাশ্রী, আমার ঠিকানা, নিজ ভূমি নিজ গৃহ ও মিশন নির্মল ভারত, বিভিন্ন ভাতা প্রদান, স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীর সমাজসাথী জীবন বীমা প্রদান।
- শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য সংখ্যালঘু ছাত্রছাত্রীদের সাইকেল প্রদান।
- প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থ কৃষকদের ফসলের ক্ষতিপূরণ প্রদান সহ প্রাণীসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রাণীমিত্রা কর্মসূচীকে স্বাথক রূপ দিতে আমরা বদ্ধ পরিকর।

সৌমেন ঘোষ	রাজর্ষি চক্রবর্তী	অর্পিতা বারিক
সহ সভাপতি	কার্যনির্বাহী আধিকারিক	সভাপতি

সকলকে শারদীয়ার প্রীতি, শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন –

অসীমা পাত্র

বিধায়ক, ধনেখালি বিধানসভা

মেহেমুদ খাঁন
সভাপতি
জামালপুর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস

সৌমেন বসু
সভাপতি
ধনিয়াখালি ব্লক তৃণমূল ছাত্রপরিষদ

অরুণ মাঝি
কর্মাধ্যক্ষ
মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ বিকাশ স্থায়ী সমিতি
ধনিয়াখালি পঞ্চায়েত সমিতি

সুকদেব মাহাতো

সভাপতি

গুড়বাড়ী ২ অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেস

প্লট বুকিং চলিতেছে
প্লট বুকিং চলিতেছে
প্লট বুকিং চলিতেছে
ধনিয়াখালী বি.ডি.ও অফিস এবং গ্রামীন হাসপাতালের সন্নিকটে এই প্লট
বাড়ী করিবার জন্য বা ব্যবসা করিবার জন্য
উপযুক্ত এক মনোরম পরিবেশ
N
S
SITE PLAN OF MOUZA PURBAKALIKAPUR,J.LNO-96.
ON L.R PLOT NO-193,281,282,UNDER P.S-DHANIAKHALI,DIST-HOOGHLY.
VILLAGE ROAD
L.R DAG NO-293
8' WIDE CONCRETE COMMON PASSAGE
8' WIDE PASSAGE
DHANIAKHALI HOSPITAL ROAD
আজই যোগাযোগ করুন
9832282501/7047670231
Plot Sale Booking Now
Contact No.
9832282501
7047670231
9732964363
Just Call Now

খবর সোজাসুজি
উৎসব সংখ্যা - ২০২৫

KHABOR SOJASUJI

RNI NO.WBBEN/2023/87806 (Govt. Of India)

EDITOR - ISRAIL MALLICK

স্বত্বাধিকারী,মুদ্রক ও প্রকাশক - ইসরাইল মল্লিক
সম্পাদক - ইসরাইল মল্লিক

মুদ্রণ সহযোগী - বর্ষা অফসেট এন্ড প্রিন্টিং প্রেস
শব্দবিন্যাস ও অলংকরণ - জয়ন্ত দত্ত
প্রচ্ছদ শিল্পী - সুরজ শেঠ

খবর সোজাসুজি'র পাঠক পাঠিকা, বিজ্ঞাপনদাতা ও শুভানুধ্যায়ীদের পত্রিকার পক্ষ থেকে জানাই শুভ শারদীয়ার আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা -
প্রকাশক, খবর সোজাসুজি

মূল্য - ২৫০ টাকা

খবর সোজাসুজি'র পক্ষে ইসরাইল মল্লিক কর্তৃক গ্রাম - মথুরাপুর,পো ঃ - শিপতাই, থানা - জামালপুর, জেলা - পূর্ব বর্ধমান,পিন - ৭১২৩০৮ , পশ্চিমবঙ্গ হইতে প্রকাশিত ও মূদ্রিত।

Mobile - 9434566498 E-mail - khaborsojasuji@gmail.com

সম্পাদকীয়

আপনাদের শুভেচ্ছা ও আর্শীবাদে তৃতীয় বর্ষে পদার্পণ করল খবর সোজাসুজি উৎসব সংখ্যা।গত বছরের ন্যায় এ বছরও আপনাদের কাছ থেকে অভূতপূর্ব সাড়া পেয়েছি।কেবলমাত্র পশ্চিমবঙ্গ নয়,পশ্চিমবঙ্গের বাইরে থেকেও অনেকে লেখা পাঠিয়েছেন।নবীন ও প্রবীণ লেখকদের লেখায় সমৃদ্ধ আমাদের এই উৎসব সংখ্যা।সকলের লেখা বিবেচিত না হলেও সকলকে আমরা ধন্যবাদ জানাই আমাদের আবেদনে সাড়া দিয়ে লেখা পাঠানোর জন্য। ছোটগল্প, অনুগল্প,প্রবন্ধ,রম্য রচনা এবং ছড়া ও কবিতার সমাহার এই উৎসব সংখ্যা।যদিও আমাদের খবর সোজাসুজি উৎসব সংখ্যায় কবিতা ও ছড়ার ভিড় বেশি।কারণ খবর সোজাসুজি উৎসব সংখ্যার জন্য কবিতা ও ছড়া আমাদের পত্রিকা দপ্তরে বেশি এসে পৌঁছেছে।আমরা যথা সম্ভব চেষ্টা করেছি বেশিরভাগ ছড়া ও কবিতাকে স্থান দিতে।নবীন ও প্রবীণ মিলিয়ে মোট ৪৬ জন লেখকের লেখা নিয়ে প্রকাশিত হল খবর সোজাসুজি উৎসব সংখ্যা ২০২৫।সাহিত্য ও সুস্থ সাংস্কৃতিক পরিবেশ গড়ে তোলার অভিমুখে আমাদের পথ চলা। আর সেই মহৎ উদ্দেশ্য নিয়েই আমাদের উৎসব সংখ্যার প্রকাশ। আমরা কৃতজ্ঞ পত্রিকা পরিবারের সদস্যদের কাছে, পাঠকদের কাছে,বিজ্ঞাপনদাতাদের কাছে এবং শুভানুধ্যায়ীদের কাছে।যে সমস্ত বিজ্ঞাপনদাতা বিজ্ঞাপন দিয়ে আমাদের পত্রিকার উৎসব সংখ্যা বের করতে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন তাদের কাছে আমরা বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।আশা করি,আগামী দিনেও আপনারা এভাবে আমাদের পাশে থেকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবেন।

ইসরাইল মল্লিক
সম্পাদক,খবর সোজাসুজি

খবর সোজাসুজি
উৎসব সংখ্যা ২০২৫

সূচিপত্র

লেখক পরিচিতি ঃ (৪-৬)

ছোটগল্প

১.একসাথে - ভাস্কর সিনহা -০৭
২.সামাজিক - তপন তরফদার -০৯
৩.দেখা অদেখা - অরুণকুমার মান্না -১১
৪.গুরুদক্ষিণা - মানিক চন্দ্র সৌ -১২
৫.অনিকেত এবং তার
স্মৃতি বিস্মৃতি - সুফি রফিক উল ইসলাম -১৪
৬.মিথ্যে কথা - জয়ন্ত বারিক -১৬
৭.দুনিয়ায় ব্যাবাক রাজাবাবা - মাখনলাল প্রধান -১৭
৮.মার্তৃরূপেণ সংস্থিতা - ঋতম পাল -২০
৯.মুংরি - দিব্যেন্দু দত্ত -২২
১০.দয়াশঙ্করের ভূত দর্শন - মিঠুন মুখার্জী -২৫
১১.মালবাবু - সুব্রত মিত্র রানা -২৭

অনুগল্প

১.শারদীয়ায় পুনর্মিলন - চন্দ্রানী মজুমদার -২৮
২.বিষাদময় এক চৈত্র দিনে - লাজবী মুখার্জী -২৯
৩.পর্বান্তর - পিনাকী দত্ত -৩০
৪.প্রথম দেখা - রঞ্জন কুমার ব্যানার্জী -৩১
৫.সীমানার ও'ধারে - মিলি ঘোষ -৩২
৬.দুর্গোৎসব - সুরঞ্জীত গাইন -৩৪
৭.তমসো মা জ্যোতির্গময় - মলয় পাল -৩৫

প্রবন্ধ

১. কালের কবিয়াল - রবীন বসু -৩৬
২. নীরব যে মানুষ - তন্ময় কবিরাজ -৩৯
৩. ২৫০ বছরের ডাক বিভাগে
ডাকহরকরা - হিমাদ্রি শেখর দাস -৪১

রম্য রচনা

১. বিরাট সাহেবের যোগ ব্যায়াম - অনুপম বিশ্বাস -৪৫

কবিতা ও ছড়া

১. তারাটি - জুমেলী সরকার -৪৬
২. অনুভবের অনুভূতিতে - কেতকী বসু -৪৬
৩. চোখ রে আমার চোখ - বিজন দাস -৪৭
৪. স্বচ্ছতার আলোয় - ডাঃ সেখ সাবের আলি -৪৭
৫. এখন কেমন আছ সুতপা - শাশ্বত বোস -৪৮
৬. মেঠো পথ - আজিজ উন নেসা -৪৮
৭. চাঁদের হাসি - প্রতীতি সরকার -৪৯
৮. নির্বাক জোৎস্নার গল্প - এরশাদ -৪৮
৯. বিশেষ বিশেষ দিনে - সুভাষিতা ঘোষ (দাস) -৪৮
১০. কালের প্রতিধ্বনি - তীর্থঙ্কর সুমিত -৫৩
১১. মন রাঙানো শরৎ - সুজন দাশ -৪৯
১২.সম্মোহিত - শ্রীধর -৫০
১৩. তবু এসো পথ ভুলে - গৌতম ঘোষ-দস্তিদার -৫০
১৪.. এসো কবিতা লিখি - বিদ্যুৎ ভৌমিক -৫০
১৫. বদলানো প্রতিচ্ছবি - সঙ্গীতা ব্যানার্জী -৪৯
১৬. ধুলোমাটির জীবন - তুষার ভট্টাচার্য -৫০
১৭. সবটা আসলে ভালোই হয়েছে - অমিত কুমার গোস্বামী -৫১
১৮. গ্রীষ্মের দুপুরে - বিপদতারণ চৌধুরী -৫১
১৯. হবে যে মরণ - কাশীনাথ মোদক -৫১
২০. ভয় - তরুণ কুন্ড -৫২
২১. বায়না - সজল চক্রবর্তী -৫১
২২. দীপাবলী - অভিজিৎ পাত্র -৫২
২৩. আমার আর্তি - কার্তিক পাত্র -৫২
২৪. স্মরণে পহেলগাম - সিদ্ধেশ্বর দত্ত -৫৩

লেখক পরিচিতি

১. **বিজন দাস** - জন্ম ১৯৫৭ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর পূর্ব বর্ধমান জেলার মহিষগড়িয়া গ্রামে। মূলত ছড়া লেখক। এযাবৎ তিনখানা বই প্রকাশ পেয়েছে। হেই ছড়া তোর পায়ে পড়ি,প্যারাম পাম ছড়ার খাম,আর তা চু কিত কিত।

২. **অরুণকুমার মান্না** - ৪ ঠা মার্চ ১৯৭১, হুগলির তারকেশ্বর থানার বিনগ্রামে। খুব ছোট থেকেই সাহিত্য সেবায় মগ্ন।

৩. **সুফি রফিক উল ইসলাম**- কবি,গল্পকার, ক্রীড়া নিবন্ধকার,ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সাংবাদিক।নেশা কবি সম্মেলন, সাহিত্যসভা, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সুযোগ পেলে ছুটে যাওয়া। নিবাস পূর্ব বর্ধমানের মেমারির সুলতানপুরের পৈতৃক সঞ্চয়িতা ভবন।

৪. **ডাঃ সেখ সাবের আলি** - জন্ম ৭ ফেব্রুয়ারি,১৯৬১, পূর্ব বর্ধমান জেলার রায়নাএ থানার শ্যামসুন্দরে। কবিতা, গান, গল্প ও ছড়া লেখক।

৫. **বিদ্যুৎ ভৌমিক** -হুগলির তারকেশ্বরের চাঁদুরের বাসিন্দা। ৭০ দশকে কবি বিদ্যুৎ ভৌমিক 'মহুয়া ' ও পরে 'মহুয়া মন' সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদনার কাজে নিবিষ্ট ছিলেন । সেই সময় দুটি কাব্যগ্রন্থ ছাড়া ও কয়েকটি সংকলন গ্রন্থ সম্পাদনা করেছেন। বর্তমানে সাংবাদিকতা করেন।

৬. **লাজবী মুখার্জী** -নিবাস - কলকাতার, পাইকপাড়া।অণুজীববিদ্যা বিষয় নিয়ে স্নাতকোত্তর উত্তীর্ণ হলেও ছোট বয়স থেকেই সাহিত্যের প্রতি এক অদ্ভুত টান আর সেই ভালোবাসার টানে সাহিত্য জগতে প্রবেশ।

৭. **রবীন বসু** - জন্ম ১৯৫৮, দক্ষিণ ২৪ পরগনা। প্রকাশিত কবিতার বই ১২,গল্পগ্রন্থ ৩, উপন্যাস ১, কাব্যোপন্যাস ১।কবি রমেন্দ্রকুমার আচার্যচৌধুরী স্মৃতি পুরস্কার ২০২৩ ও অন্নদাশঙ্কর রায় স্মৃতি সম্মাননা ২০২৩ প্রাপক।

৮. **মানিক চন্দ্র সৌ** - পশ্চিম বর্ধমান জেলার দুর্গাপুরের আমরাই গ্রামে ১৯ জানুয়ারি ১৯৬৫ সালে মধ্যবিত্ত কৃষক পরিবারে জন্ম।রাষ্ট্রবিজ্ঞানে অনার্স ও বিএড উত্তীর্ণ । পেশায় শিল্প শ্রমিক।মনের মানুষ ও মনের মানুষ দ্বিতীয় খন্ড নামে দুটি উপন্যাসের রচয়িতা ।

৯. **তন্ময় কবিরাজ** - বাড়ি - দলাই বাজার, রসুলপুর, পূর্ব বর্ধমান। ইংরাজিতে স্নাতক। পরে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইনে ডিগ্রি পাস করে বর্ধমান জেলা আদালতে প্র্যাকটিসরত। লেখালেখিতে প্রচন্ড আগ্রহ। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় লেখালেখি করেন।

১০.**তীর্থঙ্কর সুমিত** - বাড়ি -মানকুণ্ডু,হুগলি। বর্তমানে বিশ্ববাংলা সাহিত্য পরিষদ সংগঠনের সভাপতি। নিজ সম্পাদিত পত্রিকা একালের ছিন্নপত্র ও আহোরী।

১১. **সুজন দাশ** - জন্ম - বাংলাদেশের চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্গত বোয়ালখালী উপজেলার উত্তরভূর্ষি গ্রামে ১৯৭০ সালের একুশে এপ্রিল। লেখালেখি-বাংলাদেশ ভারত সহ বিশ্বের বিভিন্ন বাংলা ভাষাভাষী পত্রিকায় লিখে থাকেন। প্রকাশিত গ্রন্থ চারটি। বর্তমানে আমেরিকার নিউ জার্সিতে বসবাস করেন।

১২. **তুষার ভট্টাচার্য**- বহরমপুরে থাকেন।দীর্ঘদিন কবিতা লিখছেন।দেশ, সানন্দা, কৃত্তিবাস সহ বিভিন্ন লিটল ম্যাগাজিনে কবিতা প্রকাশিত হয়েছে ।প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ ৪টি।

১৩. **তপন তরফদার** - স্বেচ্ছাবসর প্রাপ্ত ব্যাংক ম্যানেজার। দশটি গল্প গ্রন্থ ও পনেরটি উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে। ৫০০ টি পত্র পত্রিকার নিয়মিত লেখক। বেলুড় মঠের রামকৃষ্ণ মিশন ও কলকাতার মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রজীবন। বতর্মান নিবাস প্রেমবাজার, খড়্গপুর।

১৪. **ভাস্কর সিনহা** - একজন আইআইটি দিল্লি থেকে পাস করা প্রশিক্ষিত ইঞ্জিনিয়ার। সাসটেইনেবিলিটির সাথে কোয়ালিটি এবং সেফটি ফিল্ডে কাজ করে থাকি। ছোটবেলা থেকেই লেখালেখির প্রতি ঝোঁক ছিল। অসংখ্য লিটল ম্যাগের সাথে যুক্ত।

১৫.গৌতম ঘোষ-দস্তিদার - কলকাতার বাসিন্দা,অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক।

১৬. **জুমেলী সরকার**- শিলিগুড়ি শহরের মেয়ে এখন মালদার বাসিন্দা। ভারতীয় রেলে কর্মরত।কবি ও বাচিক শিল্পী হিসেবে জনপ্রিয়তা লাভ করেছেন।

১৭. **চন্দ্রানী মজুমদার** - উত্তর ২৪ পরগণা জেলার মছলন্দপুরের উত্তর চাতরা'র বাসিন্দা। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও ইন্দিরা গান্ধী ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি থেকে যথাক্রমে সমাজতত্ত্বে স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর। বর্তমানে রাজ্য সরকারের ভূমি রাজস্ব পরিদর্শক পদে কর্মরত। লেখিকার প্রকাশিত একক গ্রন্থ গুলি যথাক্রমে -'রুদ্ধশ্বাস আতঙ্ক', 'শ্যাওলা জমেছে বুকে', 'রহস্য যেখানে গভীর', 'বৃষ্টি ভেজা চোখে', 'দহন জ্বালা' এবং 'স্রোতের বিপরীতে'।

১৮.**শাশ্বত বোস** - জন্ম ১৯৮৯ সালের জানুয়ারি মাসে পশ্চিমবঙ্গের হুগলি জেলার শ্রীরামপুর শহরে। তার বিভিন্ন লেখালিখির মধ্যে উল্লেখযোগ্য রচনা 'ডরাইয়া মরে', 'রূপান্তরের পথে', 'প্রবাসের বিভীষিকা', 'বইমেলা ও একটি

গোলাপদ, ‘পুরোনো মর্গটার কাছে’, এবং ‘পিশাচসিদ্ধ’ ।

১৯. **মিলি ঘোষ** - মূলত বিজ্ঞানের ছাত্রী।বছর আড়াই হলো নিয়মিত লেখালেখি চলছে। কিছু পুজো সংখ্যায় লেখা বেরিয়েছে- গল্প, প্রবন্ধ, মুক্তগদ্য।

২০. **সিদ্ধেশ্বর দত্ত** - হুগলি জেলার গুড়াপ থানার খানপুরের বাসিন্দা। পেশায় - শিক্ষক। ছোটবেলা থেকেই লেখালেখি করতে ভালোবাসেন।

২১. **কার্তিক পাত্র** - বাড়ি - হাওড়া জেলার কৈজুড়ীতে।নেশা- লেখা,পেশা- মালী মাঝে মধ্যে রং,তুলিও ধরেন।

২২. **অভিজিৎ পাত্র** - জন্ম ১৯৯২ সালের ১৮ মে। হুগলি জেলার সিঙ্গুর থানার অন্তর্গত মামুদপুর (উঃ) গ্রামে বাসিন্দা। লেখালেখি ছোট থেকেই।

২৩. **সজল চক্রবর্তী** - জন্ম -১০ অক্টোবর,১৯৫৩,ঢাকুরিয়া,কোলকাতায়। ১৯৭০-এ উচ্চ মাধ্যমিক বিজ্ঞান।

২৪. **তরুণ কুন্ডু** - জন্ম - ১৯৬০ সালের ৪ঠা মার্চ হুগলি জেলার ধনিয়াখালী ব্লকের সোমসপুর গ্রামে।১৯৭৭সালে স্থানীয় কলেজে প্রবেশের সাথে সাথে পুরো দমে লেখালেখির শুরু।

২৫. **কাশীনাথ মোদক** - গ্রাম - মনিরামবাটি, জামালপুর, পূর্ব বর্ধমান। স্বাধীন ভারতে ১৫ আগষ্ট কলকাতায় জন্ম। সাহিত্য সংস্কৃতি ভালোবাসেন। মনিরামবাটি থেকে অন্নদা নামক একটি সাহিত্য পত্রিকার দীর্ঘ বছর সম্পাদনার দায়িত্বে আছেন। ছড়া, কবিতা লিখতে ভালো বাসেন।

২৬. **বিপদতারণ চৌধুরী** - বাড়ি - পশ্চিম বর্ধমানের ডাহুকা ।অবসরপ্রাপ্ত কয়লাখনি কর্মী, সাহিত্যানুরাগী।শখ - বই পড়া ও কবিতা,প্রবন্ধ লেখা।

২৭. **অমিত কুমার গোস্বামী** - জন্ম - ১৯৮৬ সাল।বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ডিরেক্টরেট অফ রেজিস্ট্রেশন অ্যান্ড স্ট্যাম্প রেভিনিউতে অ্যাসিসট্যান্ট কমিশনার অফ্ রেভিনিউতে কর্মরত।সাহিত্যচর্চা স্কুল জীবন থেকেই।তৎকালীন চন্দননগরের কৃষ্টি পত্রিকাতে লিখতেন। পরে নানারকম লিটল ম্যাগাজিনে লেখেন। মূলত গল্প অনুগল্প কবিতা এইসব লেখার পরিসর।

২৮. **সঙ্গীতা ব্যানার্জী** - সঙ্গীতা ব্যানার্জী - বাড়ি সুভাষগ্রাম। সরিষা রামকৃষ্ণ মিশন থেকে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপন করে সোনারপুর বিদ্যাপীঠ থেকে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা শেষ করে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে সুরেন্দ্রনাথ কলেজ থেকে বাংলায় স্নাতক ডিগ্রি লাভ করে কল্যানী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফোকলোরে স্নাতকোত্তর করে সর্বশেষ ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ইউনিভার্সিটির অধীনে বিষ্ণুপ্রিয়া বি.এড কলেজ থেকে বি.এড করেন।তারপর বেশ কিছুদিন ধরে রামকৃষ্ণ অ্যাকাডেমি স্কুলের শিক্ষকতার সাথে যুক্ত ছিলেন। বর্তমানে লেখালেখির সাথেই আবদ্ধ। বর্তমানে DRAFT এর লাইফ টাইম মেম্বার।

২৯. **শ্রীধর** - বাড়ি - পশ্চিম মেদিনীপুরের চাঙ্গুয়াল।কবি,ছড়াকার,গল্পকার ও বাচিক শিল্পী। ‘সাঁঝের বেলা’ সাহিত্য রত্ন সম্মান,সৃষ্টি সারথি সাহিত্যপুরস্কার, ‘ছন্দের হাট’ পত্রিকা কর্তৃক ‘ছন্দব্রতী’ এবং বাংলা সাহিত্য পত্রিকা কর্তৃক ‘জীবন ধর্মী কবি’ উপাধি প্রাপ্ত, রৌপ্যপদক সহ বিভিন্ন সম্মাননা ও শংসাপত্র প্রাপ্ত, আত্মপ্রচার বিমুখ লেখক বর্তমানে লেখালেখি করে চলেছেন।

৩০. **এরশাদ** - বাড়ি - কোচবিহারের বক্সিগঞ্জে। শৈশব থেকে কবিতায় মগ্ন,লেখেন ভালোবাসা থেকে,খোঁজেন মুক্তির সুখ।সাহিত্যচর্চায় নিবেদিত প্রাণ,তার কলমে উঠে আসে হৃদয়ের কথা।

৩১.**প্রতীতি সরকার** - বাড়ি - রায়গঞ্জ, উত্তর দিনাজপুর।পেশায় শিক্ষিকা। যদিও পদার্থবিজ্ঞানের ছাত্রী তবে সাহিত্যচর্চা ছোটবেলা থেকেই।

৩২. **আজিজ উন নেসা** - জন্ম - ১৯৭২ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর পূর্ব বর্ধমান জেলায়।এনআইটি দুর্গাপুর থেকে বি.ই ও এম টেক করলেও ছোটবেলা থেকেই সাহিত্যের প্রতি আসক্ত। প্রকাশিত বই - ‘নিজেকে খুঁজে পাওয়া’ (আনন্দ প্রকাশনী), সংকলনগ্র ‘কবিকণ্ঠ’(নভোনীল সাহিত্য প্রকাশনী), ‘সপ্রোসাইন ভলিউম টু’(দ্য কুইল পাবলিকেশন)।

৩৩. **কেতকী বসু** - জন্ম ১৯৭৭ সালের ডিসেম্বরে।দার্জিলিং এ।প্রাথমিক শিক্ষার পর কলকাতায় চলে আসা।ছোট থেকেই ডাইরী লেখার অভ্যেস,পরে বড়ো হওয়ার সাথে সাথে লেখা ছোট পত্রিকায়,সাথে গানের চর্চা। সানন্দায় বহু বার বিতর্ক বিভাগে লেখার সাফল্য হিসেবে সেরা এওয়ার্ড লাভ।

৩৪. **অনুপম বিশ্বাস** - জন্মগ্রহণ করেন ২৬ শে আগস্ট ২০০৭ সালে পূর্ব বর্ধমান জেলার কাটোয়া শহরে।পিতা রামপ্রসাদ বিশ্বাস,মাতা লক্ষ্মী বিশ্বাস। কবি অনুপম বিশ্বাস বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় লেখালেখি করেন।

৩৫. **হিমাদ্রি শেখর দাস** - পূর্ব মেদিনীপুর জেলার কাঁথিতে জন্মগ্রহণকারী লেখক, প্রাবন্ধীক হিমাদ্রি শেখর দাস এর লেখার হাতেখড়ি দেব সাহিত্য কুটির শুকতারা এবং পত্রভারতীর কিশোর ভারতীতে। বাংলাদেশ সহ রাজ্যের ত্রিশটির বেশি পত্রিকায় লেখালেখি করেন। প্রকাশিত গল্প সংকলন অচেনা (২০২২), আনন্দ (২০২৩), sense of honour(২০২৩), শপথ (২০২৪),মনোনিবেশ (২০২৫), অল্পস্বল্প - কবিতা, প্রবন্ধ, গল্প(২০২৫)।

৩৬. **মলয় পাল** - বাড়ি - ভাস্তাড়া, হুগলি। পেশায় শিক্ষক।একজন অতি সাধারণ বেহিসাবি মনের মানুষ।
৩৭. **সুরঞ্জীত গাইন** - জন্ম ১৯৮৪ সালের ৮ অক্টোবর। বাংলাদেশের খুলনা জেলার দাকোপ উপজেলার সাহেবেরাবাদ গ্রাম। মাতা লীলা গাইন।পিতা তপন গাইন।দশ বছর বয়সে সাহিত্য সৃষ্টি আরম্ভ।কাব্য গুরু বিশ্ব বন্দিত কবি পুরুষোত্তম কাজী নজরুল ইসলাম।অসংখ্য পত্রিকায় সাহিত্য প্রকাশিত। রচিত গ্রন্থের সংখ্যা প্রায় একশত পঞ্চাশ। অধিকাংশ বই প্রকাশনীর খরচে প্রকাশিত। আন্তর্জাতিক সাহিত্য উৎসব হতে স্বীকৃত কবি। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পুরস্কার প্রাপ্ত। বিশ্বের বহু দেশ হতে কাব্য সাধনায় প্রশংসিত ও অভিনন্দিত। আবৃত্তি শিল্পী, চিত্র শিল্পী, অনুবাদক ও সঙ্গীত স্রষ্টা রূপে বিশ্ব বিখ্যাত।
৩৮. **রঞ্জন কুমার ব্যানার্জী** - পূর্ব বর্ধমান জেলার জামালপুর ব্লকের মহিষগড়িয়া গ্রামের বাসিন্দা। পেশা-পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার গ্রুপ 'এ' আধিকারিক। ইংরাজি সাহিত্যে স্নাতকোত্তর। পড়তে ভালো লাগে উপন্যাস আর ছোট গল্প। প্রিয় লেখক-বুদ্ধদেব গুহ। প্রিয় গল্প-সৈয়দ মুজতবা আলীর ক্ষ্মনোনাজলক্ষ্ম। হবি-বাগান তৈরি; নিজের বাড়িতে ষোলো রকমের ফলের বাগান নিয়েই অবসরযাপন পরিবারের সাথে। মঞ্চে থাকতে বিশেষ করে যাত্রা-নাটকে অভিনয় খুব আকর্ষণ করে।
৩৯. **পিনাকী দত্ত** - পিনাকী দত্ত - পেশায় শিক্ষক কিন্তু নেশায় ভ্রমণ বিলাসী। বেড়ে ওঠা বর্ধমানের গ্রামীণ পরিবেশে। নাগরিক জীবনে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন না। মাটির কাছাকাছি থাকতে ভালবাসেন।স্বপ্ন দেখেন ধর্মহীন ও বৈষম্যহীন সমাজের।
৪০. **মিঠুন মুখার্জী** - উত্তর ২৪ পরগণা জেলার গোবর ডাঙায় জন্ম। বাংলা অনার্স ও এম.এ(প্রথম শ্রেণীতে) পাশ করার পর সাহিত্যচর্চা শুরু।এ যাবত একশোর বেশি কবিতা ও গল্প বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। 'নারীশক্তি' নামে একটি সংকলনও প্রকাশ পেয়েছে। উল্লেখযোগ্য গল্প 'ব্রাত্য জীবন', 'কন্যাসুখ' ও কবিতা 'নষ্টনীড়', 'মহান জীবন' ইত্যাদি।
৪১. **দিব্যেন্দু দত্ত** - জন্ম ২০০৩ সালের ১২ই সেপ্টেম্বর পশ্চিম বর্ধমানের দুর্গাপুরে। বর্তমানে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সে পাঠরত। কিন্তু সাহিত্যের প্রতি টান ছোটবেলা থেকেই।ঋত্বিক, পেখম, এবং শব্দ পত্রিকা, অন্বেষা,পথের সুজন ইত্যাদি বিভিন্ন নামী পত্রপত্রিকার পাশাপাশি খসড়া, সাতকাহন, নৈঋত, মরীচিকা, প্রতিভা ম্যাগাজিন, বর্ণাক্ষর, সৌনিতা, নীরব আলো প্রকাশনী ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকাশনীর সংকলন ও সংখ্যায় অণুগল্প,কবিতা, ভৌতিক , অলৌকিক ও থ্রিলার ভিত্তিক গল্প প্রকাশিত হয়েছে।
৪২.**ঋতম পাল** - বর্তমানে স্নাতক তৃতীয় বর্ষের ছাত্র। শখ লেখালেখি করা। এছাড়াও গল্প, কবিতা পড়তে ও লিখতে ভালোবাসেন।
৪৩. **মাখনলাল প্রধান** - কলকাতার বাসিন্দা,১৯৫৯ সালে পূর্ব মেদিনিপুর জেলায় জন্ম। স্কুল জীবনের শেষের দিকে দু একটা লেখা শুরু হয়।১৯৯৮/৯৯ সালে বড়দের গল্পের বই ' পাখিদের কথা' এবং ছোটোদের গল্পের বই 'স্ট্যাচুভূত' প্রকাশিত হয়।
৪৪. **সুভাষিতি ঘোষ (দাস)** - সুভাষিতা ঘোষ (দাস) - জন্ম বীরভূম জেলায়।সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা। প্রকাশিত প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'অন্বেষণে '-আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলা ২০২৩। প্রকাশিত প্রথম উপন্যাসিকা 'অল্প একটু আকাশ'- আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলা ২০২৪।
৪৫. **সুব্রত মিত্র রানা** - জন্ম ১৯৭২। পিতৃভূমি বর্ধমান শহর, কৈশোর থেকে মাতৃভূমি গুড়াপ, হুগলির বাসিন্দা। আত্মপ্রকাশ 'শুকতারা'য়। লিখেছেন 'সন্দেশ', যুগান্তর, 'চাঁদের হাট, কিশোর বাংলা প্রভৃতিতে। কবিতা প্রকাশিত হয়েছে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় প্রকাশিত 'কৃত্তিবাস', 'তাঁতঘর', 'কাহ্ন' 'কৃতি এখন'র মত বিভিন্ন লিটিল ম্যাগাজিনে। প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ- 'উপগ্রহের ডাক বাক্সে'।
৪৬. **জয়ন্ত বারিক** -পেশায় উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলের একজন সহকারি শিক্ষক ও নেশায় একজন সিভিল ইঞ্জিনিয়ার। অন্যায়ের প্রতিবাদে গর্জায় তার কলম। নানান পত্রপত্রিকায় বিভিন্ন বিষয়ে লিখে পাঠকের মন জয় করেই আনন্দ পান। নিজের লেখা ও কণ্ঠে আকাশবাণীর সমীক্ষায় স্থান পাওয়া বিশেষ দিন।

খবর সোজাসুজি
খবর সোজাসুজি
চোখে চোখ রেখে কথা বলে !!!

ছোটগল্প

একসাথে

ভাস্কর সিনহা

তারা পড়ত দুর্গাপুর মডেল স্কুলে। শহরের শান্ত সকালগুলোতে, যখন সূর্যের প্রথম আলো এসে পড়ত শ্রেণীকক্ষের জানালার ফাঁক দিয়ে, সেই মুহূর্তে তাদের হৃদয়ে ফুটে উঠত নতুন দিনের স্বপ্ন। অর্ক ছিল একটু ভাবুক প্রকৃতির, তার চোখে সর্বদা লেগে থাকত এক গভীর কৌতূহলের ছাপ। সে সবকিছুতেই খুঁজে ফিরত অজানা প্রশ্নের উত্তর। দীপান্বিতা ছিল দৃঢ়চেতা, সাহসী ও আত্মবিশ্বাসী; ইতিহাসের পাতায় খুঁজে ফিরত জীবনের চিরন্তন শিক্ষা। আর শ্রেয়া ছিল শান্ত, নম্র, এবং কবিতার প্রতি অনুরক্ত। তার চোখে-মুখে ছিল এক মায়াবী প্রশান্তি, যেন শান্ত পুকুরের জলে ভেসে থাকা পদ্মের পাপড়ি।

তাদের বন্ধুত্ব ছিল দুর্গাপুরের তরুণ প্রজন্মের জীবন্ত প্রতীক। স্কুলের মাঠে বসে আড্ডা দেওয়া থেকে শুরু করে বইয়ের পাতায় পাতায় হারিয়ে যাওয়া, প্রতিটি মুহূর্তে তারা ছিল একে অপরের পাশে। তারা শুধু বন্ধু নয়, ছিল একসঙ্গে নতুন স্বপ্ন দেখার সহযাত্রী।

সেই সময় দুর্গাপুরে রাজনৈতিক অস্থিরতা বেড়েই চলছিল। শহরের হাওয়ায় লেগেছিল অজানা আশঙ্কার স্পর্শ। কল-কারখানার শ্রমিকরা নেমে পড়েছিল আন্দোলনে, প্রশাসনিক জটিলতায় আটকে ছিল শহরের বহু উন্নয়ন প্রকল্প। পরিবেশ দূষণের ভয়াবহতায় জনসাধারণের মনে জমে উঠছিল ক্ষোভ ও হতাশা। এ রকম চাপা উত্তেজনার মাঝে, তিন বন্ধুর হৃদয়ে জন্ম নিল সমাজ বদলের এক অদম্য স্বপ্ন।

একদিন স্কুল শেষে শহরের ছোট্ট চায়ের দোকানে বসে তারা সিদ্ধান্ত নিল, শুধু স্বপ্ন দেখলেই হবে না, এবার সেই স্বপ্নের জন্য কিছু করতে হবে। দীপান্বিতা ইতিহাসের উদাহরণ দিয়ে বলল, ''মানুষের ঐক্য এবং সাহসই সব বিপ্লবের মূল শক্তি।'' অর্ক ভাবুক চোখে বলল, ''আমরা যদি আমাদের এই ছোট্ট উদ্যোগ দিয়ে পরিবর্তনের সূচনা করতে পারি, তাহলে সেটা হবে পৃথিবী বদলে দেওয়ার এক নতুন গল্প।'' শ্রেয়া হাসি মুখে কবিতার ছন্দে বলে উঠল, ''আমাদের স্বপ্নগুলো হোক সাহসের মতো অটল, হোক ভালোবাসার মতো কোমল।''

পরদিন থেকেই তারা ছোট ছোট উদ্যোগ নিতে শুরু করল। স্কুলের দেয়ালে পত্রিকা বের করল, যেখানে শহরের সমস্যা ও সমাধানের কথা লেখা থাকত। তাদের উদ্যোগে শহরের তরুণরা একত্রিত হতে লাগল। তারা বুঝতে পারল, ছোট উদ্যোগই একদিন বড় বিপ্লবের সূচনা করতে পারে। তাদের স্বপ্নের আলোতে জেগে উঠল পুরো শহর।

তিন বন্ধুর এই ছোট্ট উদ্যোগ ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ল শহরের প্রতিটি প্রান্তে। তারা প্রমাণ করল যে, ভালোবাসা, ঐক্য এবং সাহসের মাধ্যমেই সমাজের প্রকৃত পরিবর্তন সম্ভব। দুর্গাপুরের প্রতিটি মানুষ অনুভব করল এই পরিবর্তনের স্পন্দন। তারা জানত, তাদের বন্ধুত্ব ও স্বপ্নের শক্তি শুধু দুর্গাপুরেই নয়, হয়তো একদিন পুরো পৃথিবীকেই বদলে দিতে পারবে।

এক বিকেলে তারা বসেছিল স্কুলের মাঠে। সূর্য তখন পশ্চিম আকাশে অস্ত যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে, আকাশের গায়ে ছড়িয়ে আছে লাল, কমলা, আর নীলের অপূর্ব মিশ্রণ। দীপান্বিতা ইতিহাসের বইটি নিয়ে আলোচনা শুরু করল;''আমরা পৃথিবীর ইতিহাসে দেখেছি, বড় বড় পরিবর্তন আসে ছোট ছোট প্রচেষ্টার মাধ্যমেই।''

অর্ক তার ভাবুক চোখে তাকিয়ে বলল, ''হ্যাঁ, আমাদের সমস্যাগুলো জটিল, কিন্তু আমরা একত্রে যদি কিছু একটা শুরু করি, তাহলে নিশ্চয়ই কিছু পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব।''

শ্রেয়া তার কবিতার বই বন্ধ করে মৃদু হেসে বলল, ''সমাজ বদলাতে হলে আমাদের সবার আগে বদলাতে হবে নিজের দৃষ্টিভঙ্গি। আমাদের বন্ধুদের, পরিবারের সবাইকে বুঝতে হবে কেন পরিবর্তন প্রয়োজন।''

সেই থেকে তারা সিদ্ধান্ত নিল, স্কুলে একটি ছোট্ট সেমিনারের আয়োজন করবে। তাদের এই পরিকল্পনায় সাহায্যের হাত বাড়ালেন তাদের প্রিয় শিক্ষক অমল স্যার। তিনি বললেন, ''পরিবর্তনের জন্য দরকার সাহস

এবং ঐক্য। তোমাদের ছোট্ট উদ্যোগ থেকে হয়তো বড় কিছু ঘটতে পারে।"

স্কুলের সেমিনারের দিন উপস্থিত হল। মঞ্চে দাঁড়িয়ে অর্ক পরিবেশ রক্ষার গুরুত্ব নিয়ে হৃদয়স্পর্শী ভাষায় কথা বলল। তার কথায় ছিল গভীর আবেগ, যা শ্রোতাদের মনের গভীরে গিয়ে প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল। দীপান্বিতা ইতিহাসের আলোকে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের গল্প তুলে ধরল, তার সাহসী উচ্চারণে ফুটে উঠছিল অতীতের সংগ্রাম আর ভবিষ্যতের আশার আলো। শ্রেয়া তার নিজের লেখা কবিতার মাধ্যমে ভালোবাসা ও ঐক্যের বার্তা দিল, তার সুরেলা কণ্ঠে ছড়িয়ে পড়ল এক নতুন জাদুকরী অনুভূতি। তাদের এই প্রচেষ্টা দেখে পুরো স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে সৃষ্টি হল এক নতুন আলোড়ন।

সেই আলোড়ন পৌঁছাল বাড়ি থেকে বাড়িতে। তিন বন্ধু বুঝতে পারল, সমাজের পরিবর্তন শুরু হয় মানুষের মন থেকে। তারা এবার উদ্যোগ নিল স্থানীয় ক্লাব ও সামাজিক সংগঠনের সঙ্গে যোগাযোগ করার। ক্লাবের বড়রা প্রথমে অবাক হলেও, পরে তারা তিন কিশোর-কিশোরীর আন্তরিকতার কাছে হার মানলেন। তাদের চোখে ছিল আশা, বিশ্বাস এবং সাহসের নতুন আলো। ক্লাবের বড়রা তাদেরকে সব রকম সহযোগিতার আশ্বাস দিলেন এবং একসঙ্গে শহরের পরিবেশ রক্ষা ও শ্রমিকদের ন্যায্য দাবির পক্ষে মিছিল করার প্রস্তুতি শুরু করলেন।

শীঘ্রই সেই দিন এল। শহরের রাস্তায় জড়ো হলেন অসংখ্য মানুষ। তরুণ-তরুণী, শ্রমিক, শিক্ষক, ব্যবসায়ী, ছাত্র-ছাত্রী;সবাই হাতে হাত রেখে একসঙ্গে পথ চলতে শুরু করল। স্লোগানে মুখরিত হল পুরো শহর। তাদের কণ্ঠে ধ্বনিত হল সমাজ পরিবর্তনের বার্তা, ঐক্যের ডাক, ভালোবাসার সুর। সেই মিছিলের স্লোগান যেন নতুন যুগের সূচনা করছিল, যেন এক নতুন দিনের ঘোষণা, যেখানে থাকবে সৌহার্দ্য, ন্যায়বিচার ও শান্তির চিরস্থায়ী আবাস।

এই উদ্যোগে শহরের মানুষ নতুন করে জেগে উঠল। প্রশাসন বাধ্য হল জনগণের দাবির প্রতি মনোযোগ দিতে। কল-কারখানার শ্রমিকদের আন্দোলন পেল নতুন মাত্রা; পরিবেশ দূষণের বিরুদ্ধে নেওয়া হল কঠোর প্রশাসনিক পদক্ষেপ। দুর্গাপুরে ফিরে এল নতুন এক প্রাণশক্তি, যে শক্তি ছিল ঐক্য, সাহস এবং ভালোবাসার অপূর্ব সমন্বয়।

এইসব ঘটনার মাঝেই অর্ক ও শ্রেয়ার মাঝে জন্ম নিয়েছিল এক মিষ্টি অনুভূতি। তাদের চোখে চোখ পড়লে লজ্জায় দু'জনেই হেসে ফেলত। স্কুলের করিডোরে, বইয়ের পাতায়, আড্ডার ছোট ছোট মুহূর্তে তাদের মনের মধ্যে ফুটে উঠছিল নতুন এক প্রেমের কুঁড়ি। দীপান্বিতা তাদের দেখে মুচকি হেসে বলত, "সমাজের পরিবর্তনের সাথে সাথে হৃদয়ের পরিবর্তনও হচ্ছে দেখছি!"

এই ছোট্ট হাসি, এই মৃদু ভালোলাগা ছিল তাদের বন্ধুত্বের আরও একটি সুন্দর অধ্যায়। তাদের হৃদয়ে জমে উঠছিল নতুন এক অনুভূতি, যা তাদের আরও কাছে নিয়ে আসছিল, আরও দৃঢ় করছিল তাদের ঐক্য। শ্রেয়া তার কবিতায়, অর্ক তার স্বপ্নে নতুন দিনের ছবি আঁকছিল। দীপান্বিতা তাদের পাশে দাঁড়িয়ে সবসময় সাহস জোগাচ্ছিল, তাদের বন্ধুত্বের বন্ধনকে করছিল আরও শক্তিশালী।

দুর্গাপুরের আকাশে তখন নতুন দিনের সূর্য উঁকি দিচ্ছিল। তিন বন্ধুর স্বপ্ন, সাহস এবং ভালোবাসায় ভরা এই দিনটি হয়ে উঠল ইতিহাসের এক স্মরণীয় মুহূর্ত। তাদের ছোট্ট উদ্যোগ থেকে জন্ম নিল এক নতুন আন্দোলন, এক নতুন স্বপ্নের বাস্তবায়ন। তারা বুঝতে পেরেছিল, সত্যিকার পরিবর্তন আসে আন্তরিকতা, ঐক্য এবং ভালোবাসার মাধ্যমেই।

সামাজিক

তপন তরফদার

আমরা সবাই জানি মানুষ সামাজিক হয়ে সমাজের জন্য নিজকে শুধরে নিতে জানে। এটাও জানে কিছু মানুষ আছে যারা জেনে শুনেও নিজেদেরকে শুধরায় না, শুধরাবার বিন্দু মাত্র চেষ্টা করেনা। এটাই সমাজের বৈশিষ্ট্য। কিছু পরিবার আছে যারা নিজেরা সমাজের সঙ্গেই পাল্টে ফেলে এবং সমাজকে প্রগতি পন্থী পথে পরিচালিত করার আপ্রাণ চেষ্টা করে যায়। প্রগতিশীল হয়ে সমাজের, মানুষের উপকার করতে পারলে যে তৃপ্তি পাওয়া যায় তা ওরা বুঝবে না যারা কোনদিন ওই সমাজের জন্য অপরের জন্য কিছুই করেনা।

আমাদের গোবিন্দপুর পাড়ার ডাক্তার বাবু হরিশ চন্দ্র দে ডাক্তারির সঙ্গে সামাজিক দায়বদ্ধতা কে মান্যতা দেন। ভাল মন্দের পার্থক্য বুঝিয়ে দেন। হরিশের ছেলে মহেশ বাবার আর্দশকে আন্তরিকভাবে ভালোবাসে. শ্রদ্ধা করে। বড় হয়ে ডাক্তার হবে মানুষের সেবা করবে। মহেশ চেষ্টা করেও ওই ডাক্তারি পড়ার পরীক্ষায় পাশ করতে পারেনা। হরিশ বলে শিক্ষকরাও সমাজের ভালোর জন্য অনেক কাজ করতে পারে। শিক্ষকরা দেশের মেরুদন্ড গড়ে তোলে। মহেশ সাফল্যের সঙ্গে পাশ করে শিক্ষক হয়। ওকে শিক্ষকতা করতে সুন্দরবনে পাঠানো হয়। পৃথিবীর সব থেকে বড় 'ম্যানগ্রোভ' এই সুন্দরবন।

নাম সুন্দরবন,কে রেখে ছিল,কেন রেখেছিল কি উদ্দেশ্যে রেখেছিল জানার চেষ্টা করেও সঠিক প্রমাণিত তথ্য জানতে পারেনি মহেশ। অনেকে মনে করে এখানে প্রচুর সুন্দরী গাছ আছে বলে সুন্দরবন বলা হয়। আবার অন্য মত এই অঞ্চলটিকে সমুদ্রের বন বলা হত। ইংরেজদের উচ্চারণের বিকৃতির ফল স্বরূপ সুন্দরবন হিসাবে পরিচিতি পেয়েছে। মহেশের স্কুল মাতলা নদী পেরিয়ে সজনেখালি ছাড়িয়ে ঝাড়খালির নোনাভাটি গ্রামে। অন্য ব্যক্তিরা সচেষ্ট হত যাতে ওই সব জায়গায় না যেতে হয়। মহেশ কিন্তু মনের আনন্দেই মেনে নিয়েছে। ২০০৪সালে প্রখ্যাত লেখক অমিতাভ ঘোষের পুরস্কার প্রাপ্ত উপন্যাস 'দি হাঙ্গরি টাইড',সলমান রুশদির বুকার পুরস্কারজয়ী 'মিডনাইটস চিলড্রেন' উপন্যাসে সুন্দরবনের পটভূমিতে লেখা। সারা বিশ্বের নজরে এসেছে সুন্দরবন। নৌকায় যেতে যেতে দেখেছে সুন্দরী, গেওয়া গাছের ঝুপসি ছায়া কাদা মাটিতে মাখামাখি করছে কুমির। রয়েল বেঙ্গল টাইগারদের দেখা পায়নি। আগে আরও ঘন ছিল এই বন। চোরা কারবারিরা কাঠের জন্য ধ্বংস করছে এই বন।

বেশির ভাগ মানুষ দরিদ্র থেকে দরিদ্রতম।রয়েল বেঙ্গল টাইগারদের বাস। ওদের সঙ্গে প্রকৃতির সঙ্গে ধাপ্পাবাজ মানুষদের সঙ্গে লড়াই করে বেঁচে থাকতে হয় বলেই কি সুন্দর নাম সুন্দরবন। মহেশ সাধারণ মানুষের বেঁচে থাকার মধ্যে কোনো সৌন্দর্য খুঁজে পায় না। কিন্তু এদের বেঁচে থাকার লড়াইকে কুর্ণিশ জানাতে হয়। নদী নালায় বনে জঙ্গলে কাঁকড়া, মাছ,মধুর ওপরেই এদের জীবন। এরা সরল মনে বিশ্বাস করে ওঝা গুনিনদের। স্বামী সমুদ্রে যত দিন মাছ ধরে বাড়িতে ফিরবে না ততদিনে সিঁথিতে সিঁদুর দেয়না। এই প্রথা চালু করার পিছনে বৈজ্ঞানিক কোনো যুক্তি নেই। বুঝালেও ওরা বোঝেনা,প্রথা ভাঙতে পারেনা। ভয় পায়। শিশুরা ছাড়া গরুর মত বড়ো হয়। কিশোর হলেই সংসারের আয়ের জন্য যে কোনো কাজে লাগিয়ে দেওয়া হয়। মেয়েদের অবস্থা আরও করুণ। নারী পাচারকারীদের খপ্পরে পড়ে যায়। অনেক সময় দেখা যায় বাড়ির লোকেরাও টাকার লোভ এড়াতে পারেনা।

মহেশ ভেবে ভেবে ঠিক করতে পারেনা কোন বিষয়টি নিয়ে এদের সচেতন করবে, সমাজের কাজে লাগাবে। 'তুষার কাঞ্জিলাল বিদ্যালয়' সদ্য জুনিয়র স্কুলে উন্নত হয়েছে। স্কুলের পরিচালক কমিটির সভাপতি নরেশ নস্করের একটা ঘরে ভাড়ায় থাকে মহেশ। নরেশ বাবু বলেছিল ভাড়া দিতে হবেনা।মহেশ জোর করেই ভাড়া দেয়। নরেশের এক মেয়ে দুই ছেলে। মেয়ে বড় নাম ছায়া। উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছে। বড় ছেলে দেবেশ সপ্তম ও ছোট ছেলে ভবেশ পঞ্চম শ্রেণিতে পড়ে। ওদের মা সুলতা সহজ সরল গৃহকর্ত্রী। সুলতা বলে আমার ছেলেদের সঙ্গে তুমিও দুটো ডাল ভাত খেয়ে নেবে। মহেশ বলে সে তো ভাল কথা। কিন্তু মাসিমা আমার খাওয়ার খরচটা আমি দোবো। সুলতা বলে তোমার জন্য

আমাদের খরচ বাড়ছেনা। আমাদের যা রান্না হয় তাতেই হয়ে যাবে। তাও যদি তোমার আপত্তি থাকে তুমি আমার বাচ্চাদের পড়াশোনা দেখিয়ে দিও। তোমার মনে কোনো সংশয় থাকবেনা। মহেশ অবাক হয়ে যায়। সুলতা কি পড়াশুনা করেছে জানেনা। এত সুন্দর করে গুছিয়ে মানুষের মন জয় করে অসাধারণ কথা বলতে পারে এই সাধারণ মা। সমাজের সচেতনতা এদের মধ্যেই জাগ্রত হওয়া জরুরী।

মহেশ স্কুলে চালু করতে পেরেছে খাওয়ার আগে ভাল করে সাবান দিয়ে হাত ধোওয়া। বোঝাতে পেরেছে হাত ধোওয়ার উপকরিতা। কিন্তু মাঠে ঘাটে শৌচ করলে সকলের কত ক্ষতি হয় বুঝলেও কাজের সময় অবুঝ হয়ে যায়। কি করা যায়। নরেশ বাবু ও চেষ্টা করে চলেছেন, কিন্তু উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়নি। মহেশ ছায়া দেবেশ ভবেশদের পড়ানো শেষ করে নিজেই ওই বনবাদাড়ে শৌচ করা খারাপ কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গে ছায়া বলে আমাদেরকে কি পরিমাণে লজ্জায় পড়তে হয় যা সবাইকে বলা যায়না। মহেশের সঙ্গে ছায়া খোলামেলা কথা এবং মেলামেশা কবে থেকে শুরু হয়েছে তা দুজনেই ভুলে গেছে। মহেশ বলে আমি একটা পরিকল্পনা করেছি তোমারা যদি সাহায্য কর। ছায়া বলে মনপ্রাণ দিয়ে করব।

মহেশ গ্রামের পূজারী মদনের উপর নজরদারি করে। সন্ধা নামলেই কানে পৈতে লাগিয়ে বিলের ধরে গাড়ু নিয়ে ঝোপের মধ্যে বসে পরে। শনিবারের বার বেলা শেষ করে সূর্য অস্তমিত। মদন যেই বসেছে দুর থেকে একটা আওয়াজ ভেসে আসলো অনেকটা বাঘের মত। হঠাৎ দেখা যায় হেলে পড়া গরান গাছের তলায় আলোর ঝলক। বনবিবি এক হাতে লাঠি অন্য হাতে ত্রিশূল। বাতাসে ভেসে আসে কিরে মদন আমার পূজা করিস আর এতো খারাপ কাজ করিস। কোনো রোগ হলে আমাকে ডাকবি না। তোদের কলেরা হবে। মদন ছুটে দেবীর পায়ে পরতে যায়। কাউকে পায়না। মদন হাঁক দিতে দিতে ঘর মুখো, চিৎকার করে বলতে থাকে বনবিবির দেখা পেয়েছি। উনি আদেশ করেছেন যেখানে সেখানে শৌচ করলেই মহামারি হবে।

যে কথা এতদিন বলে আসছিল নরেশরা কোনো কাজ হচ্ছিলো না।পূজারীর কথায় ভয় পেয়ে গ্রামের সবাই বদআভ্যাস ত্যাগ করলো। নরেশ বাবু খুব খুশি। মহেশকে ধন্যবাদ জানালে মহেশ বলে আসল কাজ করেছে ছায়া আর দেবেশ। ছায়া দেবীরূপ ধারন করেছিল। দেবেশ বাঘ সেজেছিল। আমি শুধু আলোর ও শব্দের কারসাজি করেছি। গ্রামবাসীরা ভয় পেয়ে মান্য করে ভগবানের নির্দেশ। তাই প্ল্যান করে পূজারীর উপরই প্রয়োগ করি। একশো শতাংশ ফলের আশায়।

সুখবর, নোনাভাটি গ্রাম নির্মল গ্রামের স্বীকৃতি পেয়েছে। নরেশবাবু কে সরকারের পক্ষ থেকে সর্ম্বধনা দেওয়া হবে। সুদিনের মাঝেই দুঃসংবাদ। মহেশকে বারাসাতের বিধান রায় স্কুলে বদলি করা হয়েছে।নরেশবাবু বলে, আপনাকে আমরা ছাড়বোনা। মহেশ বলে ব্যক্তি নয় সমাজই প্রধান। আমরা সামাজিক হলে একে অপরের কাজে সাহায্য করলে আমরা সামাজিক হবো।

মাতৃ মন্দির রাইস মিলস প্রাঃলিঃ

গুড়াপ, হুগলি

মাতৃ ভূমি রাইস মিলস এলএলপি

মহানাদ, হুগলি

মোঃ - 7699313815/9932356263

দেখা অদেখা

অরুণকুমার মান্না

দিদি ভাই, কোথায় নামবেন ? চাঁপাডাঙ্গা এলে একটু নামিয়ে দিও ভাই। বয়েস হয়েছেতো, রাস্তাঘাট অতটা আর ঠিক করতে পারি না।

ঠিক আছে। ভাড়াটা করুন।একটা পঞ্চাশ টাকার নোট কন্ট্রাক্টরের হাতে দিলে ত্রিশ টাকা ফেরত দেয়।

পাশের সিটে বসে আছেন একজন গেডুয়া বস্ত্রধারী সুপুরুষ। কাঁধে একটা ঝুলি। মাথার চুলে জট। লম্বা দাড়ি। চুল, গোঁফ, দাড়ি সবই সাদা। শরীরে যথেষ্ট বয়েসের ছাপ। তবু সুপুরুষ বললাম এই কারণে, এক ঝলক দেখলেই বোঝা যায় গায়ের রঙে এখনো মরচে পড়েনি। উন্নত কপাল। ভাসা ভাসা চোখ। নিজের মনে অজান্তেই ভক্তি শ্রদ্ধার জন্ম হয়।

কন্ট্রাক্টর বুঝে উঠতে পারছে না, এনার সংগে ভাড়া নেওয়া কি ঠিক হবে! পরক্ষণেই মনকে স্থির করে, চাইবো নাই বা কেন! এতো আমার চাকরি। দিনের শেষে বাস মালিককে তো টাকাটা বুঝিয়ে দিতে হবে। মালিকতো আর এত কিছু বুঝবে না। সে লাভ চায়। আর এত টাকার বাস চালিয়ে লাভ যদি না পায়, চালাবেই বা কেন! না চালালে আমারও চাকরি যাবে।

আপনার ভাড়াটা-

আমার কাছেতো পয়সা নেই।

তাহলে বাসে উঠলেন কেন?

আর হাঁটতে পারছি না তাই।

তাই বাসে উঠে পড়লেন! আপনার মর্জি মতন বাসে উঠে পড়বেন, সিটে বসে আরাম করে যাবেন, আর ভাড়া চাইলেই পয়সা নেই! আজকের দিনে একটা ক্ষ্যাপা পাগলের কাছেও পয়সা থাকে।

শুধু পয়সা নয় বাবা, আমার কিচ্ছু নেই, এই পরনেরটুকু বাদ দিয়ে। আমি সর্বত্যাগী। ঈশ্বরের আশীর্বাদে বেঁচে আছি এই যা।

কোথায় নামবেন?

তারও ঠিক নেই। যেখানে হোক নামিয়ে দিও। আবার আমি হাঁটবো। এইতো বেশ কিছুটা বিশ্রাম পেয়ে গেলাম।

তাহলে সামনের স্টপেজে নেমে যাবেন।

থাক না উনি বসে আছেন। ওনার যেখানে ইচ্ছা নামবেন না হয়।

কেন উনি কি আপনার কেউ হন? তাহলে ওনার ভাড়াটা তো আপনিই দিয়ে দিতে পারতেন।

গুড়বাড়ী ১ গ্রাম পঞ্চায়েত

(ধনিয়াখালি পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত)

▸ অরণ্য সপ্তাহ ▸ কন্যাশ্রী প্রকল্প ঃ মুখ্যমন্ত্রীর স্বপ্নের কন্যাশ্রী প্রকল্প এখন বিশ্বে সমাদৃত ▸ স্বাক্ষরতা ঃ স্বাক্ষরতার মাধ্যমে সার্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা ▸ কমপিউটার প্রশিক্ষণ ঃ কমপিউটার প্রশিক্ষণের মাধ্যমে স্বনির্ভরতা ▸ বিনা ব্যয়ে চিকিৎসা ঃ তৃণমূল স্তরে স্বাস্থ্য পরিষেবা ▸ বিশুদ্ধ পানীয় নলকূপ ঃ নিরাপদ জলপান, করবে সুস্থ জীবন দান ▸ বিপর্যয় মোকাবিলা ঃ পঞ্চায়েত আপনার পাশে ▸ ঢালাই রাস্তা ও মোরাম রাস্তা ঃ গ্রামীণ যোগাযোগের উন্নতি ▸ দুয়ারে সরকার প্রকল্পকে সফল করা

অসীমা ধাড়া
প্রধান

সুভাষ টুডু
উপপ্রধান

গুরুদক্ষিণা

মানিক চন্দ্র সৌ

ডাক্তারবাবু কাল ছুটি দেবেন।শুনেই মনটা আনন্দে নেচে উঠলো।চার দিন হাসপাতালে পেটে ব্যথা নিয়ে ভর্তি।সুস্থ আছি।রাতটা পেরোলেই সকালে ড্রাইভার গাড়ি নিয়ে আসবে।

কেবিনে পাশের সিট ফাঁকা।ওয়াচম্যান নকুল ছেলেটা খুব ভালো।কথাবার্তায় আন্তরিকতা পাওয়া যায়।বাকি সব রোবট।নির্দিষ্টি কাজ করে চলে যায়।বাড়তি কথা বলার সময় নেই।ও না থাকলে হাসপাতালে থাকাটা আরো খারাপ লাগতো।

নতুন পেশেন্ট ভর্তি হল।সঙ্গে প্রচুর লোকজন এসেছে।সিকিউরিটি গার্ডরা আটকাতে পারেনি।গণ্যমান্য কেউ।পার্টির নেতাও হতে পারে।একজনকে কাছে ডেকে জিজ্ঞাসা করলাম

--- উনার কি হয়েছে ?

--- সকালে বাথরুমে পড়ে গিয়ে উঠতে পারছেন না।

--- আপনারা অনেকেই এসেছেন ?

--- সবাই খবর পায়নি, নাহলে এখানে দাঁড়ানোর জায়গা থাকত না।

--- বুঝেছি, ভালো মানুষ,খুব জনপ্রিয়।

--- দাদা প্রত্যেকের পাশে দাঁড়ান।একজন সমাজসেবক।

কিছুক্ষণের মধ্যেই কথাটার সত্যতা উপলব্ধি করলাম।ডাক্তারদের নিষেধ সত্ত্বেও নতুন লোকের আসা যাওয়া কমেনি।প্রত্যেকে এসে খোঁজ নিচ্ছেন।প্রিয় দাদাকে মুখটা দেখিয়ে দায়িত্ব পালন করছেন।লক্ষ্য দাদার কাছের মানুষ হওয়া। রাতের ঘুমটা গেল।ভিড় কমলে জিজ্ঞাসা করলাম --- দাদা বাথরুমে পড়লেন কিভাবে ?

--- কিভাবে পড়লাম নিজেই জানিনা।

--- তারপর থেকেই কি ?

--- একেবারেই উঠতে পারছিনা।পা দুটি কাজ করছে না।দেখছেন ক্যাথেটার, ইনজেকশন, স্যালাইন ডাক্তাররা কি করছেন !

--- ওটা আপনার ভালোর জন্যই।

---দাদা আপনি কি করেন ?

সমাজসেবা। শিক্ষকতা করতাম।বিনা পারিশ্রমিকে প্রচুর ছেলেমেয়েকে মানুষ করেছি।আমার হাতে ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার প্রচুর বেরিয়েছে । তারা দেশ বিদেশে প্রতিষ্ঠিত।

--- আপনার ছেলে মেয়েরা ?

--- দুজনেই ইঞ্জিনিয়ার, বিদেশে থাকে।

--- সমাজ সেবাতে কিভাবে এলেন ?

--- নেশা আর কি ? ছেলেরা ছাড়ে না।রাজনীতিতে ঢুকে ভোটে জিতলাম।এখন জনগণের সেবা একমাত্র ব্রত।ওদের কাছের মানুষ হয়েছি।

--- আপনাকে দেখেই বুঝেছি।

উনি নিজের প্রশংসা অন্যকে শোনাতে ব্যস্ত। আমার সম্পর্কে কিছু বলার কোন সুযোগ দিলেন না। কি ভেবে একবার বললেন ---- আপনার নাম কী ? কোথায় থাকেন ?

--- রঘুনাথ রায়। আসানসোল।

--- দূরে আছেন, তাই চেনেন না। নিশিকান্ত চ্যাটার্জি নাম করবেন। যেকোন সমস্যায় পড়লে সাহায্য পাবেন।

সিস্টার এসে ইনজেকশন দিয়ে গেলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই উনি ঘুমিয়ে পড়লেন।সর্বক্ষণের সাহায্যকারী ছেলেটা টুলে বসে ঝিমুতে লাগলো। আমিও ঘুমিয়ে পড়লাম।

মাঝ রাতে নিশিকান্তবাবুর কাতর ডাকে ঘুম ভাঙ্গে।

--- রঘুবাবু পটি যাব ।ছেলেটা পালিয়েছে। কাউকে ডেকে দিন।

পটির চাপে নিশিকান্তবাবুর মুখটা বড়ই অসহায় লাগলো। কেবিন থেকে বেরিয়েই নকুলকে চোখে পড়ল। হাতে স্যালাইনের বোতল। কারো চেঞ্জ করতে যাচ্ছে। রোগীদের স্ট্রেচার টানার সাথে সাথে ছেলেটা অনেক কাজ শিখেছে। ক্যাথিটার চেঞ্জ , স্যালাইন দেওয়া, ড্রেসিং করা ইত্যাদি।

--- কাজের ছেলেটা কোথায় গেল নকুল ?

--- আপনাদের কেবিনে হারুর কথা বলছেন তো ?

--- মদ খেতে গিয়েছে । ওদের যা ধর্ম। সকালের আগে পাবেন না।

পটি করানোর কথা নকুলকে কীভাবে বলি ? দেরি হলে বিছানায় করে ফেলবেন।একই কেবিনে কিভাবে থাকবো।

--- আমাকে একটু সাহায্য করবে ?

--- চলুন, আমি দু'নম্বর কেবিনে স্যালাইন চেঞ্জ করে আসছি।

নকুল কথা রেখেছিল। আমাকে হাত লাগাতে হয়নি। সুন্দরভাবে পটি করিয়ে যাবার সময় বলেছিল --- ভালো আছেন স্যার।

নিশিকান্তবাবু নকুলের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। অপরাধীর মতো মুখটা কেমন বিবর্ণ হল।উজ্জ্বল মুখে কে যেন কালি ঢেলে দিল ! নিশিকান্তবাবু কিচ্ছু বললেন না। নকুল বেরিয়ে গেল।

পরদিন সকালে নকুল আমাকে হুইলচেয়ারে গাড়ির কাছে নিয়ে চলল।

--- মাস্টারকে চেনো নকুল ?

--- হ্যাঁ।

--- বাহ ! ভালো গুরু পেয়েও ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার হতে পারলে না।

--- ওসব সবার ভাগ্যে জোটে না।

--- কেন এরকম কথা বলছ ?

--- মা বাবাকে ছোট থেকে দেখিনি। লোকের বাড়িতে কাজ করে অনেক কষ্টে পড়াশোনা চালাচ্ছিলাম। নিশিকান্ত স্যারের ছেলে আমার সঙ্গে একই শ্রেণিতে পড়তো। ক্লাসে আমি প্রথম আর উনার ছেলে দ্বিতীয় হতো।

--- তুমি তো ভালো ছেলে হে । পড়াশোনা ছাড়লে কেন ?

--- এখন বুঝেছি স্যারের রাগ ছিল আমার উপরে। ছেলে কোন ক্লাসে আমার সাথে পাল্লা দিয়ে প্রথম হতে পারেনি।সুযোগ পেলে অহেতুক প্রহার তিরস্কার করতেন। একদিন সময়ের অভাবে অংকের হোমওয়ার্ক করতে পাইনি।সেই অজুহাতে আমাকে প্রচন্ড মারধর ও উপহাস করেন। সাত দিন বিছানাগত ছিলাম। পালিত বুড়িমার সেবায় বেঁচে উঠি । সব জেনে মা স্কুলে আর যেতে দেয়নি।

--- সামান্য ঘটনাতে স্কুল ছাড়লে ?

--- পালিত বুড়ি মার দিব্যি কি করে ভাঙ্গি বলুন ?

জোর করে ৫০০ টাকা নকুলের হাতে গুঁজে দিই। সুস্থ আছি।নকুলকে ভুলে ছিলাম। এক বৎসর পরে শরীরে সমস্যা দেখা দেয়। হাসপাতালে চেকআপে আসি। নকুলের খোঁজ করতে ওয়ার্ডে যাই। সিস্টার বলেন --- উনি এখন কলকাতায়।

--- এখানে চাকরি ছেড়ে দিয়েছে।

--- না ওনার মাস্টারমশাইয়ের কিডনি খারাপ হয়।

--- মাস্টারমশাইয়ের নামটা কি?

--- নিশিকান্ত চ্যাটার্জি।

--- নকুল কি কিডনি দেবে ?

--- পরিচিতরা কেউ কিডনি দিতে রাজি হয়নি। একমাত্র নকুলই রাজি হয়।

নকুল শেষে মাস্টারকে কিডনি দেবে ! একলব্যের গল্প শুনেছি। আজকের যুগের একলব্যের গুরুদক্ষিণা দেওয়া জানলাম

ধনিয়াখালি ১ গ্রাম পঞ্চায়েত

(ধনিয়াখালি পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত)

▶ অরণ্য সপ্তাহ ▶ কন্যাশ্রী প্রকল্প ঃ মুখ্যমন্ত্রীর স্বপ্নের কন্যাশ্রী প্রকল্প এখন বিশ্বে সমাদৃত ▶ স্বাক্ষরতা ঃ স্বাক্ষরতার মাধ্যমে সার্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা ▶ কমপিউটার প্রশিক্ষণ ঃ কমপিউটার প্রশিক্ষণের মাধ্যমে স্বনির্ভরতা ▶ বিনা ব্যয়ে চিকিৎসা ঃ তৃণমূল স্তরে স্বাস্থ্য পরিষেবা ▶ বিশুদ্ধ পানীয় নলকূপ ঃ নিরাপদ জলপান, করবে সুস্থ জীবন দান ▶ বিপর্যয় মোকাবিলা ঃ পঞ্চায়েত আপনার পাশে ▶ ঢালাই রাস্তা ও মোরাম রাস্তা ঃ গ্রামীণ যোগাযোগের উন্নতি ▶ দুয়ারে সরকার প্রকল্পকে সফল করা

ববিতা সরেন
প্রধান

সোমনাথ সামুই
উপ প্রধান

অনিকেত এবং তার স্মৃতি বিস্মৃতি

সুফি রফিক উল ইসলাম

দুপুর রোদে টোঁ টোঁ করে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে ঘরে ফিরে পড়ন্ত দুপুর বেলায় অনিকেত মুড়ি চিবুচ্ছিল, এমন সময় হঠাৎ অভ্র এসে তাকে জানিয়ে গেল দুজন ভদ্রলোক তাকে খুঁজছে। চোখে বোবা দৃষ্টি নিয়ে খালি গায়ে লুঙ্গি পরেই বাইরে বেরিয়ে এলো। অচেনা দুই ভদ্রলোক তাকে জিজ্ঞেস করলেন অনিকেত সেন কি তারই নাম--- যিনি একটু লেখালিখি করেন। তাঁরা আরো জানালেন যে তাঁরা একটা শারদীয়া পত্রিকা প্রকাশ করতে চান তাই অনিকেত সেনের একটি লেখা তাঁদের পত্রিকার জন্য চান। শোনা মাত্র অনিকেতের দুকানে যেন কাঁসর ঘন্টার শব্দ আর বুকের ভিতর ঢাকের বিস্ফোরণ। তার কাছে লেখা চাওয়া --- তা-ও আবার শারদ সংখ্যার জন্য। এ নিশ্চয় রসিকতা ! সে তো এতো বড়ো জাতে ওঠেনি যে বাড়ি বয়ে লেখা চাইতে আসছেন কোনো শারদ পত্রিকার সম্পাদক। তবে কি --- না আর ভাবতে পারছে না। কিন্তু ভদ্রলোক দুজন জানালেন তাঁরা অনিকেত সেনের লেখা পুরানো ছোট পত্রিকায় দেখেছেন, পড়েছেন তাই ছুটে এসেছেন ঠিকানা সংগ্রহ করে। তাঁদের ইচ্ছা শহুরে আধুনিক যথেচ্ছ প্রকাশিত লেখক নন কিন্তু লেখার হাত আছে অথচ প্রকাশিত হতে বিশেষ পারেন নি, সেইসব লেখকদের লেখা নিয়েই পত্রিকার প্রকাশ ঘটুক। প্রচেষ্টা কে সাধুবাদ জানিয়ে লেখা দেবে এই কথা দিয়ে অনিকেত তাঁদের বিদায় জানাল এবং যথারীতি মুড়ি চিবুতে চিবুতে আজকের দিনে পুজোর চাঁদা কোথায় কত উঠল তার হিসাব মেলাতে থাকল। সেইসঙ্গে অন্য একটা পোকাও অনেকদিন পরে আবার নড়ে চড়ে উঠল --- ও যে এতদিন লুকিয়ে ছিল তা অনিকেত ভাবতে পারেনি, ভেবেছিল মরে গেছে। কি লিখবে আর কি লেখা দেবে --- !

চিন্তিত অনিকেতের মনে ঘুরে ফিরে আসছিল অনেক অনেক পুরানো দিনের সুখ-স্মৃতি। তাদের ''আড্ডা-অবসর'' কে --- যেখানে একসময় তারা কয়েকজন উঠতি 'কবি-মনা'রা 'কবি-মন' টাকে বাঁচিয়ে রাখতে একসঙ্গে জড়ো হতো। হ্যাঁ, আড্ডা অবসরে কখনো চুপচাপ মুখ বুজে বসে থাকা যেত না, আর তার উপায়ও ছিল না। কিছু না কিছু এসে পড়তোই তা না হলে ওরা হাঁফ ছেড়ে বাঁচত না। অপরের দ্বারে কড়া নেড়ে নেড়ে যখন হাতে কড়া পড়ে গেছে তখন সেই হাতে ওরা সবলে সাপটে ধরেছিল একটাকায় দুটো কলম --- দামী কলম ! নিজেরাই নিজেদের পাঠক, শ্রোতা আবার সমালোচকও। ক্ষোভ আছে কিন্তু ক্ষুধাতুর নয়, তৃষ্ণা আছে তৃষিত হয়ে রয়েছে তবু একেবারে তৃপ্তি হীন নয়, ওরা। হয়তো বা কবি মনাদের কবিতা বা গল্প পাঠের আসরে কোনো কোনোদিন জুতসই খাবারও জুটে গেল। পেটে খিদে নিয়ে কবিতা হয় না --- কে যেন বলেছিলেন, তাই হয়তো এসে গেল সিম্পির হাতে বেগুনি আর আলুর চপ, খৈয়ামের হাতে একটা গোটা নারকেল, মণিদীপার হাতে বগীথালায় মুড়ি, এণা এখুনি এসে পড়বে চা নিয়ে ---- আর কি চাই তোমাদের, দু পয়সা দামী কবি মনাদের ? ওরে বাব্বা পুষ্পরাগ তো আবার চানাচুর নিয়ে হাজির ! এগুলো কি তোমাদের মতো কবি মনাদের বেশি কিছু পাওয়া হয়ে গেল না ? তোমাদের লেখার জন্য তো কেউ বসে নেই, কোনো শারদীয় সংখ্যা তো তাগাদা দেয় না ? বারবার নালিশ জানায় না তো কোনো বিশেষ সংখ্যা, বাড়িতে ধরণা দেয় না তো কোনো পালিশ করা চাঁচা ছোলা মুখ --- একটা লেখা পাবার আশায় ? আবার যারা এসেছে তারা তোমাদের জঠর নিংড়ানো হাহাকার কে, তোমাদের মস্তিষ্ক কুরে খাওয়া সৃষ্টিকে স্বীকৃতি না দিয়ে ---- তোমাদেরকে অল্প খরচে কিনে নিতে চেয়েছে ! কেননা তোমাদের কথা তো কফি হাউসে ওঠে না, চায়ের পেয়ালায় তুফান ছোটে না --- তোমরা কবি মনারা আজও কি সদয় হবে না ?

না, ধীরে ধীরে আড্ডা অবসরের প্রয়াসে জলসিঞ্চনের অভাব দেখা দেয়। মণিদীপার বিয়ে হয়ে যায় --- বাঙালি মেয়েরা কবিতা লিখবে কি ? ওই হাতে হাতা খুন্তি, হাঁড়ি কুড়ি, ছেলে মেয়ে মানুষ করবে। এণা রূপসী না হওয়ার জন্য পণের বলি হয়ে বিয়ের কয়েক মাসের মধ্যেই লাশ কাটা ঘরে গিয়ে ঢুকেছিল। সিম্পি স্বামীর বিপথগামী অস্তিত্বের প্রতিবাদ করায় তালাকি ঐতিহ্য বহন করে, তালাকি-স্বামী প্রেরিত গুন্ডা বাহিনী দ্বারা লাঞ্ছিতা হয়ে আত্মহনন করে। খৈয়াম এখন আর কবিতা লেখে না, কবিতা বলে ---- তবে কেউ লিখে রাখে না, পাগলা গারদের চৌহদ্দির মধ্যে ধ্বনি- প্রতিধ্বনি হয়ে ঘুরে ফেরে।তার শেষ কবিতা শুনেছিল অনিকেত বোধহয় দশ বছর আগে, দেখা করতে গিয়েছিল তখন।

একটা চাকরি চাই / আমার চাকরি চাই / আমার একটা কিডনির বিনিময়ে হলেও চাই। / একটা চোখ নাও / কিন্তু চাকরি দাও। / বাড়িতে আইবুড়ো বোন / ছোট ভাইয়ের টিউশন ফি/ অসুস্থ বাবার চিকিৎসা / একটা চাকরি চাই / যে কোনো মূল্যে আমার চাকরি চাই। না খৈয়াম চাকরি পায়নি, চাকরি চাকরি করেই পাগল হয়ে সে পাগলা গারদে। পুষ্পরাগ আজ বাজারে তরকারি বেচে। তার খাতায় আর কবিতা গল্প নেই, আছে শাক সবজি, আলু পটলের হিসাব।আর অনিকেত নিজে এখনো কবিতা পড়ে তবে টিউশনি করতে যে গুলো পড়তে হয় বা পড়াতে হয় সেগুলো। কারণ এখন তার বাঁচা মরার দায় একমাত্র এই টিউশনি। তার নিজেরই একটা কবিতার লাইন ''কিছু একটা করো'' কে মনে রেখে ভোর থেকে রাত নিজের ঝরঝরে সাইকেল কে সঙ্গী করে টিউশনি করে ফেরে এ দুয়ার থেকে ও দুয়ার, এ ঘর থেকে ও ঘর। এটাই ওর বাঁচার লড়াই আর বাঁচানোর লড়াই !

পাড়াতল ২ গ্রাম পঞ্চায়েত

(জামালপুর পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত)

মানবিক পরিষেবা প্রদানের মাধ্যমে সকলের সার্বিক উন্নতি সাধনই আমাদের লক্ষ্য।
'কন্যাশ্রী'র সাফল্যে উদ্ভাসিত আমরা । নির্মল পঞ্চায়েত ও পানীয় জলের নিরাপদ সুরক্ষা প্রদান আমাদের উদ্দেশ্য।
'শিক্ষাশ্রী', 'রূপশ্রী' ও 'মানবিক' প্রকল্পের মাধ্যমে সহায়তা সুনিশ্চিত করা আমাদের একান্ত কাম্য।
'কৃষক বন্ধু' ও 'খাদ্য সাথী' প্রকল্পের মাধ্যমে আর্থিকভাবে দুর্বল পরিবারগুলিকে স্বনির্ভরতা প্রদান আমাদের লক্ষ্য।

সরস্বতী টুডু
উপ প্রধান

মাবিয়া বেগম সেখ
প্রধান

চকদীঘি গ্রাম পঞ্চায়েত

(জামালপুর পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত)

১। মিশন নির্মল বাংলা কর্মসূচীর মাধ্যমে স্বচ্ছ পঞ্চায়েত গড়ে তোলা।
২। গাছ লাগিয়ে পরিবেশদূষণ রোধ করা।
৩। এলাকার মানুষের আর্থ সামাজিক উন্নয়নের জন্য কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পগুলিকে গ্রামবাসীদের কাছে পৌঁছে দেওয়া।
৪। পাড়ায় পাড়ায় সমাধান।
৫। দুয়ারে সরকার কর্মসূচীকে সফল করে তোলা।

পার্থ প্রতীম শেঠ
উপ প্রধান

অসীমা বাগ
প্রধান

মিথ্যেকথা

জয়ন্ত বারিক

''লোকে আমায় ভালোই বলে দিব্যি চলন সই।
দোষের মধ্যে একটু নাকি মিথ্যে কথা কই।''

প্রণাম কবি শঙ্খ ঘোষকে। তাঁর কথার ধার করেই বলি, কমদামী লবণবিহীন তরকারি যেমন স্বাদ হীন।তেমনি প্রয়োজনে মিথ্যে কথা ছাড়া মানব জীবন পাওয়া খুবই মুশকিল। আমি আমার জীবনের সাথে ওতপ্রোত ভাবে যুক্ত কয়েকটা ঘটনার কথা বলব। আমার বড় মামা হঠাৎ হার্ট অ্যাটাকে মারা গেছেন এক বছর হল। আমার মা, মামা- মাসিদের মধ্যে সবার বড়। মা এর স্ট্রোক হবার পর, মা সাইক্রিয়াটিক পেশেন্ট, এমনিতেই কান্নাকাটি করে। রাত তখন ন টা, মা শুয়ে পড়েছে। মাকে যদি সত্যি কথাটা বলি, তাহলে মামার বাড়ি কারোরই যাওয়া হবে না। তাই মাকে বললাম একটু সবাই বেড়াতে যাব। ফেরার সময় মামার বাড়ি যাবো। মা তো অবাক! এত রাতে? আজ আর যাব না। বললাম, না-মা আজকেই যেতে হবে । কাল আমার সময় হবে না, সবাই যাবে, তাই গাড়ি বলে দিয়েছি। সেই অবস্থায় মামার বাড়ি পৌঁছে কাঁদতে কাঁদতে মা আমাকে প্রশ্ন করলো, কেন মিথ্যা কথা বলে এখানে আনলি? আগে বলিস নি কেন? আমি উত্তর দিতে পারিনি। দায়িত্ব পড়ল ছোটোমাসিকে কামারকুন্ডু স্টেশন থেকে আনার। বাইকে চেপে অসুস্থ মাসি বলল, খোকা? দাদার কি হয়েছে? আমি বলেছি একটু শরীরটা খারাপ । আবার মিথ্যে কথা। বিশ্বাস করো এছাড়া উপায় ছিল না।

পরের ঘটনাটি আরো মর্মান্তিক।সাত বছর আগে, আমার শাশুড়ি মা মারণ ক্যান্সার রোগে বিখ্যাত ক্যান্সার হসপিটালে, ডাক্তারবাবু আলাদা করে আমাদের বললেন আর মাত্র ছয় মাস বাঁচবে। ডাক্তারবাবুকে সরাসরি শাশুড়ি মা জিজ্ঞেস করলেন - আমি বাঁচবো তো? ডাক্তার বাবু বললেন সব ঠিক হয়ে যাবে । আমার শাশুড়ি মা আমায় খুব বিশ্বাস করতেন, তাই আমাকে বললেন বাবা সত্যি করে বলো তোমার কথাই আমি বিশ্বাস করবো। আমি বললাম যে সব ঠিক হয়ে যাবে আপনার শরীরের কষ্ট আপনাকেই ভোগ করতে হবে। আপনি মনে আনন্দ নিয়ে থাকুন , ওষুধ খান। ভালো হয়ে যাবেন।একটু সাইডে গিয়ে ভেজা চোখটা মুছে আবার হাসিমুখে শাশুড়ী মা এর কাছে এসে মনে মনে ভগবান কে বলেছিলাম, ক্ষমা করো, এই মানুষটাকে মিথ্যে কথা বলতে চাইনি,কিন্তু বলতেই হল ভারাক্রান্ত হৃদয়ে।

বাবনান গ্রাম পঞ্চায়েত

(পোলবা দাদপুর পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত)

আমাদের লক্ষ্য ঃ-

১। মিশন নির্মল বাংলা কর্মসূচীর মাধ্যমে স্বচ্ছ পঞ্চায়েত গড়ে তোলা।
২। গাছ লাগিয়ে পরিবেশদূষণ রোধ করা।
৩। এলাকার মানুষের আর্থ সামাজিক উন্নয়নের জন্য কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পগুলিকে গ্রামবাসীদের কাছে পৌঁছে দেওয়া।
৪. পাড়ায় পাড়ায় সমাধান প্রকল্পের সার্থক রূপায়ন।
৫। দুয়ারে সরকার কর্মসূচীকে সফল করে তোলা।

টুম্পা ধারা
উপ প্রধান

ওয়াসিম রেজা
প্রধান

দুনিয়ায় ব্যাবাক রাজাবাবা

মাখনলাল প্রধান

হাওড়ায় পৌঁছে লোকটা ভাবাচ্যাকা খেয়ে গেল।এ কোথায় এসেছে বুঝতে পারছে না।এ কী বাঘমুন্ডির জঙ্গল নাকি রে ! আবার দেখো,কে কোন দিকে যে ভেগে যাচ্ছে, কেউ জানছে না।লোকটা এসেছে দূর সেই গ্রামের থেকে, জঙ্গলমহলের কোন অন্তরমহলে তার বাড়ি। রেললাইন প্রথম দেখে ছিল বাপের সঙ্গে সড়কি কাটতে গিয়ে,বাপরে বাপ শুধু সড়কির জঙ্গল,শুধু জঙ্গল। মানুষ নাই একটাও।

কিন্তু কলকাতা শহরটা কোন রাজবাড়ির কারখানা দেখেনি সে কোনোদিন।এত্ত গাড়ি এত্ত গাড়ি , উঞ্জ বাবা গো ! কত্ত কত্ত লোক যাচ্ছে তো যাচ্ছে , আসছে তো আসছে। কোথায় যাচ্ছে তো যাচ্ছেই , ছুটাছুটি করছে তো করছেই , ভন ভন করে নীল মাছির মতো চলে যাচ্ছে গাড়ির পর গাড়ি।কতবার তাকে ধাক্কা দিয়ে চলে গেল কতলোক। কে বলে উজবুক,কে বলে গাঁইয়া,কে বলে ইডিয়ট ! পড়ে গেল দু'তিনবার , একবার তো একটা লোকের উপর। রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে রইল ভয়ে , ফাঁকা হলে সে যাবে।ফাঁকা আর হয় না,ঘন্টার পর ঘন্টা কেটে গেল এরকম লোক সে দেখেছিল মাড়োতলার মেলায়।না এত নয় তবে অনেক।কত্ত বড় বড় রাস্তা,কত্ত গাড়ি আর দেশ-গাঁয়ের ব্যাবাক লোক !

হঠাৎ একপাশে তাকিয়ে দেখে সে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে।তাদের রাজা বাবার বাড়ি,কত্ত কত্ত উঁচা উঁচা বাড়ি, এত্ত রাজা বাবা ! সবই রাজা বাবা ! ঠাকুর থানও আছে, মাড়োতলার ঠাকুর থান কত্ত বড় বটে।কী সোন্দর গো, গায়ে কী সাপা লেপা রঙ,কত্ত ছবি ল্যাখা। শয়ে শয়ে গাদা গাদা শুধু রাজা বাবার ঘর।আমাদের মতন ঘর নাইকো একটাও,উঠান নাই,খুঁটা নাই,চালা নাই একটাও নাই

কলাগাছ নাই,বঁইচি কুলের গাছ নাই , শালগাছ নাই , মহুয়া গাছ নাই - কিচ্ছো নাই গ কিচ্ছো নাই। গেড়িয়া নাই একটাও,জল খায় না নাকি ? জমি নাই একটাও । লোকে খায় কী ? দকানে খায় ? এত্ত লোক সকলে দকানে খায় !

এক এক জেইগায় পচাপচি ভাত-টাত,ভাঙাভুঙি জিনিস উঁচা কইরা রাখে কেনি ?

রাস্তার ধারে দাঁড়ি দাঁড়ি মুতে। কী গন্ধ ! থু থু থু ঘরের ভিতরে হাগে । ঘরে হাগে বাইরেও হাগে । শহরের লোকগুলা কী রকম যেন। একদম বুঝা যায়নি। কী রকম কইরা কথা কয় বাপা ! রাস্তার পাশে ঘরের পাশে লম্বা লাইন কইরা গর্ত ইট দিয়া গাঁইথা তাউতে জল ঢালে, মুতে,যা পারে ফেকিদেয়।কোলকাতার লোক চোখে দ্যাখতে পায়নি,চারুমা শুধু লাইট আর লাইট বাঁইধা রাখছে। দিনের ব্যালা ঘরে লাইট জ্বলে। তাউ আবার কত কত ভুলভাল কয়।কোলকাতা ঠিক মাড়োতলার হাটের মতন। শুধু দকান আর দকান। এ রকম জিনিসের দকান। মড়াচুলা নাই,কাঁসাই নদী নাই,হাট নাই।দাসের ঘরের মতো খালধারে নক্কা, আলু,টমাটম,ফুলকপির চাষ নাই।মুন্ডোল ঘরের পুখুরের মধ্যে,বিজয় হাঁসদার জমিনে শোলো মেশিন এখাঁঞে একটাও নাই।

চারদিকে শুধু লোক গিজগিজ করেঠে। দ্যাখ, কিরকম গায়ের উপরে ট্যাইপাসেঠে। মায়াছ্যানা থায় কাই বাপা ! লজ্জা টেজ্জা নাই। বাম পাশে তাকিয়ে দেখে, এপাশেও রাজা বাবার ঘর।কী সব ল্যাখা ঝুলিয়ে রাখে বড় বড় ঘরের ছামুধারে।কত্ত ফটক ঝুলানো আছে কেনি ? কত্ত যে বাঁশ দিয়া কাঠ দিয়া কী যে বাঁধাবাঁধি ! উঁচা উঁচা ঢ্যাঙা বাঁশের মাথায় দড়ি বাঁইধা কী করে বাপা !

ধুর,ভোক লাগছে,খাইত্তে হবে।

লোকটার হাঁটুর উপর ময়লা খাটো ধুতি,গায়ে একটা ফতুয়া পরা পায়ে ছেঁড়া হাওয়াই,হাতে একটা পুরোনো নাইলনের ব্যাগ।গায়ের রঙ কালো,বয়স্ক লোকটির রোগা-পাতলা শরীর আর সারা মুখে খোঁচা খোঁচা কাঁচা-পাকা দাড়ি গোঁফ।ব্যাগের থেকে মুড়ি বের করে রাস্তার পাশে বসে বসে খায়। তারপর জল খুঁজতে খুঁজতে দূরে একটা চাপাকল দেখে চলে যায়।সেখানে লাইন পড়ে গেছে,দাঁড়িয়ে থাকে। জল খেয়ে লোক যেদিকে যাচ্ছে সে সেদিকে যেতে থাকে।লোকগুলো খুব জোরসে চলে কোথায় যেন হারিয়ে যায়।কত লোক ঘষে ঠেলে খিস্তি করে রাগ দেখাতে দেখাতে পেরিয়ে চলে গেল।শুধু গেলে তো হবে না , কোথায় যাচ্ছে জানতে হবে।যেতে গিয়ে হঠাৎ উপর দিকে চোখ পড়ে যায়

হাঁ করে তাকিয়ে দেখে,এটা কী জিনিস বটে ! ট্রাফিক পুলিশ তাকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দেয়। - ওধারে দাঁড়িয়ে দ্যাখ।কোথা থেকে এসেছিস রে ?

লোকটা বুঝে পায় না এটা কী জিনিস ? চেরা বাঁশের মতো না কাঠের বাটামের মতো , তক্তার মতো সব দিয়ে

রথের মতো - কী উঁচা রে বাবা ! চোখ যায়নি আর। ততক্ষণে তার হাতের ব্যাগটা কে যেন টেনে নিয়ে চলে যায়। মোর ব্যাগ কে লিলো - বলে চিৎকার করে। হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। ব্যাবাক মুড়ি আর নক্কা ছিল। ভ্যাবাচ্যাকার ঘোর কাটে না।আবার চোখ চলে যায় উপর দিকে। কত উঁচা গো !

ট্রাফিক পুলিশ করুনার সঙ্গে বলে - কী দেখছিস রে? এটা ? এটা হল হাওড়ার ব্রিজ,রবীন্দ্রসেতু। এর নীচে গঙ্গা। এপারে হাওড়া ওপারে কলকাতা।

লোকটা ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে। সন্ধ্যেবেলা ঘরে ফেরা কাড়াগুলোর শিং বাগিয়ে গাড়ি ঘোড়া একটানা ছুটছে। দ্যাখে দু'একটা লোক বসে আছে। সেও বসে পড়ে। হাত দুটো কোলে পাতা। ফুটপাত যাত্রীরা দুটো একটা পয়সা ফেলে দিয়ে যায়।

লোকগুলো কি রকম গটমট চলে যায় ! কী ত্যাজ যেন চোখে মুখে। কাউরে দ্যাখে না গো, শোনেও না।মুখ গুলান কী সাপা রে বাপা ! দ্যাখলে ভয় করে। গাড়ি শুধু গাড়ি, যত্ত মানুষ তত্ত গাড়ি। কত্ত চাপা পড়েও।

আপাতত তাদের সঙ্গে থেকে যায় লোকটা। কোথাও যাবার কথা ছিল না।শুধু কোলকাত্তা শহর দেখবে এটাই বড় শখ ছিল।

দিন দিন শুধু গাড়ি চলে আর লোক যায় আসে,সে সেখানে বসে দ্যাখে।মাঝে মাঝে গঙ্গার দিকে তাকিয়ে থাকে। খুম বড় খালটো।মোদের কাঁসাই নদী বটে।

ট্রাফিক পুলিশটা এখানে ডিউটি পড়লে পাশে দাঁড়িয়ে লোকটাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দ্যাখে।এরকম মানুষ নিয়ে তার অনুসন্ধানের প্রচ্ছন্ন ইচ্ছে বোঝা যায় - কোলকাত্তায় যাবি না ? কত্ত বড়ো শহর।কত্ত বাড়ি,কত্ত গাড়ি,দোকান পাট লোক লস্কর তত তস্কর।

লোকটা হাঁ করে শোনে। জানতে চায় - কত্ত ধুর ?

- কোথায় দূর।ব্রিজ পেরোলেই কোলকাতা। ওই তো, ওই দ্যাখ - -

লোকটা দাঁড়িয়ে দেখার চেষ্টা করে। কোথায় শহর, সবই তো রাজা বাবার ঘর,শুধু রাজা বাবা। দুনিয়ার সব রাজা বাবার ঘর এখেনে।মাগো,এত রাজা বাবা আছে !

সে দ্যাখে দিন দিন কতো রাজা বাবা যায়।কী রকম কাপড় জামা,সোনার বরণ দ্যাখতে গো ! গটগট মটমট করে চলে যায়। যেন দ্যাবতা ! এত্ত দ্যাবতা আছে ?

ট্রাফিক পুলিশের একদিন বেশ মেজাজ ভাল থাকায় বলল - যাবি কোলকাত্তায় ?

লোকটা মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি জানায়।একটা বাসের কন্ডাক্টরকে বলে - এই একে কোলকাতায় নামিয়ে দিবি তো। বলেই তুলে দেয়।

কন্ডাক্টর তাকে ধর্মতলায় নামিয়ে দিলে সে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। এ তো অন্য রকম জেইগা,একে কোলকাত্তা শহর কয়। পুলিশ এখানে লাঠি নিয়ে তাড়া করে। বলে - হট যা হট যা।

লোকগুলো গাড়ি থেকে নামে আবার গাড়িতে উঠে চলে যায়।কে যে কোন দিকে যায়, দ্যাখা যায় না। কী আজব শহর রে বাবা ! ফুটপাতে কত্ত দকান। কত্ত মায়া-ছানা কীরকম করে যায়,ঘুরে ঘুরে দ্যাখে। কাপড় পরে না, মাথায় দেয় না। মুখ গুলান কী সাফা,ঠোঁটে আলতা পরে ক্যানো ? মাথায় চুল নাই কো মোটে। হাতে কী লম্বা লম্বা নখ। দকানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খায়,হাসে। লাজ-লইজ্জা নাই। মাটির ভিতর দিয়া রেলগাড়ি চলে রে বাবা ! পিঁপড়ার মতো লোকগুলা যখন গিড়গিড় শব্দ কইরা বারায় তখন কেমন লাগে।

শুধু লোক আর শুধু লোক। চারদিকে রাজা বাবা শুধু রাজা বাবা,তারা কী কথা বলে বুঝা যায়নি মোটে। মোদের গ্রারামের রাজা বাবা তো খুব বকে, কত্ত কথা কয়।

রাতিরব্যালা লোকের ঘুম নাই গো।শুধু শুধু গাড়ি চলে। কত্তলোক আইসে।সারা রাইত আলো জ্বইলা থায়। কোইলকাতায় অন্ধকার নাই।

একদিন দেখল বিরাট মিছিল।কী বিরাট লম্বা লাইন শেষই হয় না।সব গাড়ি বন্ধ, শুধু মিছিল।পুলিশ মিছিল নিয়ে যায়। গ্রামে মিছিলে কতজন মাত্র লোক থায়। সে তো নিজেই থাকে যখন তখন।

ফুটপাতে থেকে থেকে তার সব সয়ে যায়।সবার সঙ্গেই থাকে।বর্ষাকালে একটা ত্রিপল জুটে গেল। গ্রামে কেউ দেয় না কেন ? এক একদিন ঠোঙায় ভর্তি খাবার দিয়ে যায় লোক। কী রকম রঙ করা ভাত,কী সন্দর গন্ধ করা ভাত।এরকম খাবার সে খায়নি।রাজা বাবারা খায়। এক একদিন ভাল কিছুই জোটে না।বৃষ্টির দিনে খুব খারাপ যায়।জলে সব ভাসিয়ে নিয়ে যায়।সারারাত গাছের তলায় দকানে দাঁড়িয়ে ঠেলাঠেলি করে কাটে।

গ্যারামের ঘরে তার জল পড়ে তবু এমন হয়নি।অন্ধকারে কত্তলোক এসে কার পাশে চুপিচুপি শুয়ে পড়ে। অন্ধকারে কী যে হয়, দিনের ব্যালায় ব্যাবাক লুকায়ে যায়। ঘষর ঘষর ফসর ফসর করে ! কীর-কম কথা কয় ! বুঝা যায়নি মোটে।খরা ব্যালা কী যে হয় ! যত দ্যাশের

লোক ঔখাঞে আইসে কেনি ? যাত্রাদলের মতন কত্তো জামাটামা পরা,পায় কালা কালা জুতা।

একদিন একটা লোক ফুটপাতে মরে গেল। লোকগুলা শুধু পয়সা দিল কাঁড়ি কাঁড়ি ! ও বাবাগ , কীর-কম করল সক্কলে ! আঙ্গুল টো ছাতির সাথে মাথায় দিয়ে চলে যায়।

আর কত্তো কত্তো ঠাকুর দ্যাবতা গ,রাস্তার পাশে পাশে । কী চকমক করে ! গ্যারামে এর-কম নাই

তিথি ধইরে পরব হয় ।এ অন্য রাজা বাবার ঘর ।শুধু রাজা বাবা ।দুনিয়ায় ব্যাবাক রাজা বাবা !

কদিন হঠাৎ ঘরকে যাবার জন্য মন কেমন করছে। কুন দিকে ঘর সে জানে না। টেরেনে করে এসেছিল মনে আছে। ঘুরে ঘুরে একদিন শেয়ালদায় গেল,মানুষ অ্যাকবেরে গিজগিজ করছে পিঁপড়ার মতন ।শুধু মানুষ শুধু মানুষ গ। এত্ত মানুষ কুনঠি থায় ? কিচ্ছো দ্যাখতে দিবেনি। ঠেইল্যা ঠেইল্যা এ্যাকটা টেরেনে ঢুকি দিল। আসাম এক্সপ্রেস,বুসতে পায়নি গ। ঘরকে জায়া খুম গল্প করবে। কী রকম কোলকাত্তা শহর সে দেখল সব বইলবে। হউ ,এবার সে নিজের ঘরকে চলে যাবে। ঘরকে বলবে ব্যাবাক রাজাবাবা গ ব্যাবাক রাজাবাবা !

দাদপুর গ্রাম পঞ্চায়েত

(পোলবা দাদপুর পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত)

আমাদের লক্ষ্য ঃ

১। মিশন নির্মল বাংলা কর্মসূচীর মাধ্যমে স্বচ্ছ পঞ্চায়েত গড়ে তোলা।
২। গাছ লাগিয়ে পরিবেশদূষণ রোধ করা।
৩। এলাকার মানুষের আর্থ সামাজিক উন্নয়নের জন্য কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পগুলিকে গ্রামবাসীদের কাছে পৌঁছে দেওয়া।
৪. পাড়ায় পাড়ায় সমাধান প্রকল্পের সার্থক রূপায়ন।
৫। দুয়ারে সরকার কর্মসূচীকে সফল করে তোলা।

শুভজিৎ বারিক
উপ প্রধান

ভারতী মালিক
প্রধান

রাঃ- স্বাঃ

৮৭৬৮৩০২৪৯৬
৮৯০০৫৭০০০১
ফোন- (০৩২১৩) ২৫৯-৩৬৫

সোনা ময়রার প্রতিষ্ঠিত দোকান

জয়গুরু মিষ্টান্ন ভান্ডার

প্রোঃ- সুশান্ত কুমার নন্দী

প্রসিদ্ধ দই ও মিষ্টান্ন প্রস্তুতকারক এবং সরবরাহক।
এছাড়াও পনির, বাটার, কোল্ডড্রিংঙ্ক ও জন্মদিনের কেক পাওয়া যায়।
খানপুর (হাটতলা,চৌমাথা), হুগলী।

মাতৃরূপেণ সংস্থিতা

ঋতম পাল

সময়ের আবহে বর্ষা কেটে শরতের আগমন ঘটেছে। আর শরত মানেই নীল আকাশের সমারোহে শিউলি ফুলে সুবাসিত হয় ধরণী আর পথের ধারে ক্ষেতজুড়ে সাদা কাশফুলের দল জানান দেয় মায়ের আগমন বার্তা।শরতের এরকম পুজো পুজো গন্ধ যখন ছড়িয়ে পড়েছে, সেসময় বাজারহাটের ব্যস্ততা, দোকানে দোকানে কেনাকাটা সবমিলিয়ে উৎসবমুখর পরিবেশ। এরকম পরিবেশে কুমোরটুলি তো আলাদা অনুভূতি, ঐতিহ্যের সাক্ষী বহন করে চলেছে, যেখানে মায়ের প্রতিমা নির্মাণের কাজ হয় সেই স্থান, তাই কুমোরটুলিতেও এখন খুব জোরকদমে কাজ চলছে।তাই শঙ্করকাকুও এখন ব্যস্ত প্রতিমা গড়ার কাজে, বছর পঞ্চাশের লোকটি আজ প্রায় পয়ত্রিশ বছর ধরে এই কাজ করে চলেছে, মুখে কোনো প্রকার ক্লান্তির রেশ মাত্র নেই, হাসিমুখে ভালোবেসেই এই একটি কাজ করে চলেছে সে। শঙ্করকাকুর হাতের কাজে জাদু আছে বলে সুনাম আছে এই চত্বরে,তার গড়া প্রতিটি মূর্তিতেই মৃন্ময়ী মা যেনো চিন্ময়ী হয়ে ওঠে। তাইতো সে এই এলাকার প্রায় সব বনেদিবাড়ির পুজোর অর্ডার গুলো পেয়ে থাকেন। ''আজ আমরা চলে এসেছি এক্সপ্লোর বাংলা ইউটিউব চ্যানেল থেকে প্রখ্যাত মৃৎশিল্পী শঙ্কর পালের কাছে ইন্টারভিউ নিতে '', শঙ্করকাকু ব্যস্ত তখন খড়ের বাঁধনের কাজে।

'' তা শঙ্করবাবু আপনি কতদিন ধরে এই কাজটি করছেন? ''

'' দিন বলছো কী বাবু, বছর বলোগো বছর,তাও প্রায় পয়ত্রিশ বছর হবে। '' বাহ্, এত বছর ধরে করছেন যখন কী কী পুরস্কার পেয়েছেন যদি বলেন আমাদের ইন্টারভিউতে ''।

'' তা পেয়েছি গো বাবু, অনেকগুলোই পেয়েছি মায়ের আশীর্বাদে, বয়সতো হয়েছে অতো কী মনে থাকে........ তাও আন্দাজ করে বললে ওই আগের বারেরটা নিয়ে পঁচিশটা মতো হবে গো বাবু।'' বাহ্, তাহলে তো আপনার হাতের কাজে জাদু আছে বলতে হবে, আচ্ছা আপনার এতো বছরের কাজে সবথেকে সেরা অভিজ্ঞতাটি যদি ভাগ করে নেন আমাদের সাথে.......

শঙ্করকাকু এই প্রশ্নটি শুনে কিছুক্ষণের জন্য যেনো স্তম্ভিত হয়ে যায়। তার মনে পড়ে যায় সেই দিনের কথা।

কথিত আছে, রথযাত্রার দিন মায়ের কাঠামোয় প্রথম মাটি লেপনের দিন, আর মায়ের মূর্তির এই মাটি পতিতালয় থেকে এনে সেই মাটিতে প্রতিমা নির্মাণ হয়।

প্রতিবছরের মতোই শঙ্করকাকু এইবারও যায় সেই নিষিদ্ধপল্লীতে, ওই গলির মোড়ে, ঘুপচি এলাকায় দুই থেকে একটা বাড়ির পরে গিয়ে কাকু দরজায় কড়া নাড়ে। প্রথমবারে কেউ আসেনা দরজা খুলতে, তাই জন্য দ্বিতীয়বার সে কড়া নাড়ে...........দ্বিতীয়বারের মাথায় দরজা খুলে দেয় বছর সাতেকের ফুটফুটে একটি মিষ্টি মেয়ে। মিষ্টি মেয়েটি হাসিমুখে আনন্দের স্বরে বলে, ''দাদু, তুমি এসেছো ?''

একটু কর্কশস্বরে একটা ঘর থেকে আওয়াজ আসে, '' কীরে বিন্দি কে এসেছেরে?? '' মা, মা দাদু এসেছে, তুমি যে দাদুর কথা গল্প করে বলতে। '' শঙ্করকাকু ওপরের ঘরে উঠে যায়, গিয়ে বলে ,'' আসবো মা??? ব্যস্ত আছো ?''

পরনে ঝিকিমিকি শাড়ি, কপালে বড়োটিপ, চুলের খোপায় রঙবেরঙের ফুল গোজা, মুখে পান চিবোতে চিবোতে বছর ত্রিশের রাণী বলে,'' ওহ্ আপনি কাকু, আসুন আসুন, ব্যস্ত ছিলাম না কাকু, এই তৈরি হচ্ছিলাম আসলে, সন্ধ্যে তো হতেই চললো,তা আপনি তো মাটি নিতে এসেছেন ?? একটু বসুন আমি আসছি।''

কিছুক্ষণ অপেক্ষার পর রাণী আসে আর কাকুর হাতে মাটি তুলে দেয়,এরপর সে কাকুকে প্রণাম করতে গেলে কাকু বাধা দিতে যায়,তখন রাণী বলে,''আমাদের এই নরকে তো সন্ধ্যা নামলেই সমাজের সব শিক্ষিত ভদ্ররুপী শয়তানগুলো আসে আমাদের ছিঁড়ে খাওয়ার জন্য, সেরকমই একজন শিক্ষিত ভদ্রসমাজের ফুর্তির ফসল আমার ওই ছোটো মেয়েটা,পরেরদিন সেই বাবু এলে সে অস্বীকার করে আমার বিন্দিকে কিন্তু সে যতই অস্বীকার করুক আমি তো মা,আমি কী করে ত্যাগ করি আমার ওই ছোট্টো মেয়েটাকে তাইতো আমি এই সমস্ত জানোয়ারগুলোকে ঘেন্না করি,শুধু পেটের দায়ে.......... কিন্তু আপনিতো সেরকম নন কাকু, আপনি তো আমার চোখে একজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি,বাবার মতো, সেই কবেই

বাবাকে হারিয়েছি,আপনি আমার চোখে বাবার সমান, আপনাকে একটিবার প্রণাম করতে দিন কাকু।”

মাটি নিয়ে বেরোতে যাওয়ার সময় পিছনদিক থেকে বিন্দি বলে ওঠে ,“ ও দাদু, চলে যাচ্ছো তুমি ??? আবার কবে আসবে গো ??? জানোতো আমাদের এখানে সন্ধ্যার পর কোনো ভালো মানুষ আসেনা, সব পচা লোকগুলো আসে, শুধু তোমাকে দেখে একমাত্র ভালো বলে মনে হচ্ছে। জানো মা বলে আমার নাকি কঠিন অসুখ আছে,আমি নাকি বেশিদিন বাঁচবো না । তুমি আমার একটা ইচ্ছা পূরণ করবেগো ??

কাকু তখন বিন্দিকে আদর করে বলে,“ না দিদিভাই তোমার কিচ্ছু হবে না,তুমি যে মায়েরই রুপ,বলো কী ইচ্ছা ?” আমাকে দুর্গাপূজা দেখাতে নিয়ে যাবেগো দাদু? আমার না পূজো দেখার খুব শখ, দুগ্গাঠাকুর দেখার শখ, অষ্টমীতে মাকে অঞ্জলি দেবো, ক্যাপ বন্দুক ফাটাবো অনেকদিনের ইচ্ছা। মা তো কোথাও নিয়ে যায়না, তুমি আমাকে নিয়ে যাবেগো দাদু ?”

কাকু তখন বলে,“ আচ্ছা দিদিভাই, নিশ্চয়ই নিয়ে যাবো তোমাকে এবারে দুগ্গাপূজো দেখাতে। ”বাড়িতে এসে শঙ্করকাকু একমনে ভাবে, সত্যি তো ওই ছোটো ফুলের মতো মিষ্টি মেয়েটার কী দোষ ? ও তো এই সমাজেরই একজন, ওর তো অধিকার আছে আর পাঁচটা বাচ্চাদের মতো আনন্দ করার, মাকে দেখার, মাকে অঞ্জলি দেওয়ার, মা তো সবার মা। সমাজের কিছু বস্তাপচা নিয়ম, কিছু লোলুপ দৃষ্টিভঙ্গি ওদের একঘরে করে রেখেছে, না আর মানবো না এই নিয়ম,যে নিয়ম সমাজের ক্ষতি করে,পচা-গলা একটা নিয়ম শিশুদের আনন্দ কেড়ে নেয়,না আর নয় আর মানবো না এই নিয়ম। এই ভাবতে ভাবতে সে মায়ের মূর্তিতে মাটি লেপনের কাজ করে।

সময়ের সাথে সাথে ঢাকের তালে মা এলো, আজ অষ্টমী।শঙ্করকাকু আজকে আবার গেলো সেই জায়গায়। আগেরবারের মতোই ছোট্ট বিন্দি এসে দরজা খোলে এবং একরাশ মিষ্টি হাসি খেলে যায় তার মুখে কাকুকে দেখে। “ দাদু, ও দাদু, তুমি এসেছো ? ” হ্যাঁ, দিদিভাই এসেছি, তুমি বলেছিলে না পুজো দেখবে, অঞ্জলি দেবে, তাই তোমাকে নিতে এসেছি আজ, যাও তোমার মাকে গিয়ে ডেকে দাও।” আনন্দে আর খুশিতে বিন্দি একছুটে দৌড়ে যায় তার মায়ের কাছে। কিছুক্ষণ পরে রাণী এলে সে বলে,“ ও বাচ্চা মানুষ, তাই আব্দার করে বলে ফেলেছিলো। আপনি আবার ওর কথায় কেনো আবার শুধু শুধু......... ”

এই বলে ইতস্তত বোধ করতে থাকে রাণী। রাণীর ইতস্ততা কাটিয়ে কাকু বলে,“কিচ্ছু হবে না, তুমি ওকে তৈরি করে দাও মা, তোমার মেয়ের আজ কুমারী পুজো হবে।” কাকুর এই কথা শুনে হঠাৎই রাণীর চোখটা যেনো ছলছল করে ওঠে এক মুহূর্তে। আজ মন্ডপে মন্ডপে মায়ের অঞ্জলি সাথে কুমারী পূজা ছোট্ট বিন্দিকে নিয়ে শঙ্করকাকু পাড়ার পুজো মন্ডপে এলে সবাই কটু কথা বলতে থাকে কাকুকে, কিছুজন বলে, “কী করেছেন আপনি শঙ্করদা ,কী সর্বনাশ করলেন আপনি, ওই নিষিদ্ধপল্লীর বাচ্চা মেয়েটাকে এখানে এনেছেন কেনো, ও ওর মায়ের মতোই অপবিত্র শঙ্করদা,আপনি ওকে দিয়ে আসুন। আর এটাতো সমাজের নিয়ম নয় দাদা, আপনি কেনো শুধু শুধু......”

এইসমস্ত কথা বলে সবাই বিরক্তিকর, কুমন্তব্য করতে থাকে,কিন্তু সমাজের এই ক্ষতিকারক নিয়মকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বিন্দিকে মায়ের আসনে বসিয়ে কুমারী পূজা করায় শঙ্করকাকু। সে প্রমাণ করে দেয় যে সব শিশুরই আনন্দ করার অধিকার আছে, হোকনা সে ওই নিষিদ্ধপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেছে, তাতে সে শিশুর কী দোষ, কোনো শিশুই অপবিত্র নয়, সব শিশুই ফুলের মতো নিষ্পাপ, পবিত্র আর সর্বোপরি সেই শিশু যখন এক নারী, নারী মাত্রই মায়ের অংশ। নারী মাত্রই মাতৃরূপেণ সংস্থিতা। এভাবেই শঙ্করকাকুর মতো নাগরিকদের হাত ধরেই সমাজে পরিবর্তন আসুক, বদল ঘটুক পুরোনো সব ধ্যানধারণার,সময়ের প্রবাহে সমাজের ভাবনা,চিন্তার পরিবর্তন হওয়া দরকার।

প্রকাশিত হচ্ছে পাক্ষিক সংবাদপত্র

খবর সোজাসুজি

প্রতি ইংরেজি মাসের

১৫ ও ৩০ তারিখ

বিজ্ঞাপনের জন্য
যোগাযোগ করুন
৯৪৩৪৫৬৬৪৯৮

মুংরি

দিব্যেন্দু দত্ত

রাত একটা,ট্রেন তিন ঘন্টা লেট।কোচবিহার আসতে গিয়ে যে এরকম সমস্যায় পড়তে হবে ভাবতেও পারেনি ওরা।রাস্তা দিয়ে হেঁটে চলেছে ওরা তিনজন।রজত,চিন্ময় আর সায়ন।কোচবিহারকে রীতিমতো এক্সপ্লোর করবে বলেই ওদের প্ল্যান করে আসা।হোটেল ঠিক করা ছিল,কিন্তু পৌঁছেছে এত দেরী করে।স্টেশন থেকে বেরিয়ে রাস্তায় এসে দেখে কোনো রিক্সা,অটো কিছুই নাই। অগত্যা গুগল ম্যাপ দেখে নিজেরাই হেঁটে হেঁটে যাচ্ছে হোটেলের উদ্দেশ্যে।কিন্তু এক কঠিন বিভীষিকা যে ওদের জীবনে আসতে চলেছে সেটা ওরা জানেই না।চলতে চলতে হঠাৎ বৃষ্টি শুরু হলো।রজত বলল, আরে কোথাও চল দাঁড়াই নইলে ভিজে যাবো। এই ভাবে যাওয়া যাবে না। কিন্তু ওরা লোকালয় থেকে দূরে আছে,চারিদিক ফাঁকা তাই দাঁড়ানোর কোনো জায়গাই ওরা পেল না।বাধ্য হয়েই দৌড়ানো শুরু করলো। খানিকটা রাস্তা দৌড়ানোর পর চিন্ময় বলল, আরে ওই দেখ একটা পরিত্যক্ত বাংলোবাড়ি।চল ওটাই ঢুকি। তিনজন যখন বাংলো বাড়ির বড়ো গেট পেরিয়ে ঢুকতেই যাবে ঠিক তখন একটা ভয়ার্ত মহিলা কণ্ঠ শোনা গেল।ওরা দেখলো রাস্তার ওইপারে একটা বয়স্ক মহিলা দাঁড়িয়ে আছে।সেই মহিলা বললেন, তোরা মরবি, মরবি তোরা।যাসনে,যাসনে ওই হত্যাপুরী তে যাসনে। ওখানে মুংরি থাকে।রজত জিজ্ঞাসা করল, মুংরি আবার কি ? মহিলা বলল,ওই বাড়ির শেষ উত্তরাধিকার।আগুনে পুড়ে মারা গেছিল।কোচবিহারে অপঘাতে কোনো মেয়ে মারা গেলে তাকে মুংরি বলে। তিনজন এই কথা শুনে বিশ্রী ভাবে অট্টহাসি করে ভেতরে ঢুকে পড়লো।বাড়ির পরিত্যক্ত অবস্থা দেখে ওরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলো যে কোনো অশরীরীও এখানে থাকতে চাইবে না। চারিদিকে আগাছায় ভর্তি, বাড়ির বাইরের দেওয়াল শ্যাওলায় আচ্ছাদিত হয়েছে, পলেস্তার খসে ইঁট বেড়িয়ে এসেছে।জানলা দরজা বলে কিস্যু নেই।ওরা বাড়ির মুখোমুখি এসে দেখলো বিরাট এক কাঠের দরজা। বড় কাঠের দরজাটা ধাক্কা দিতেই প্রকাণ্ড শব্দে একটা পাল্লা খুলে পড়ে গেল।

সায়ন বলল, এতো দেখছি বিরাট বাজে অবস্থা রে।ওরা ভেতরে ঢুকে দেখলো চারিপাশ জঞ্জাল-আবর্জনার স্তূপে ভর্তি হয়ে গেছে, জায়গায় জায়গায় মাটির ঢিপি উঠেছে।সাবধানে পাশের একটা ঘরে ঢুকে পড়লো ওরা,বেশ কিছু পুরনো আমলের আসবাবপত্র আছে বটে। খানিকটা জায়গা পরিষ্কার করে নিয়ে তিনজনে মাটিতেই বসে পড়লো।সায়ন বলল, দেখি মুরগি না মুনরি আসে নাকি।সবাই হো হো করে হেসে উঠলো।বিভিন্ন গল্প গুজব করতে করতে এক ঘন্টা কেটে গিয়েছে,বৃষ্টি তখনো থামেনি।হঠাৎ দোতলা থেকে আসা প্রকান্ড একটা শব্দে সবার রক্ত জল হয়ে গেল।খানিকটা ধাতস্ত হতেই চিন্ময় বলল,আমি দেখে আসছি তোরা বস।কোনো কুকুর বা বেড়াল ঢুকে বসে আছে হয়তো।তারপর কতক্ষন কেটেছে বলা মুশকিল,দেরি হচ্ছে দেখে সায়ন রজতকে বলল,চল দেখে আসি।যেই দুজনে উঠেছে তখনি দেখলো দরজা দিয়ে চিন্ময় ঢুকছে।রজত জিজ্ঞাসা করলো, এত দেরি হলো কেনো ? চিন্ময় বলল, বলেছিলাম না ! ওই একটা কুকুর ছিল,দরজা খোলা পেয়ে ঢুকেছে।কোথাও কিছু নাই,গিয়ে দেখবি চল উপরতলাটায় পুরোনো আমলের বেশ কিছু আকর্ষনীয় জিনিস আছে। ওদের চোখ চকচক করে উঠলো,কৌতুহলী হয়ে টর্চের আলো জ্বালিয়ে সিঁড়ি দিয়ে তড়তড়িয়ে উঠে দোতলায় পা রাখলো।কিন্তু কোথায় কী ? উপরের অবস্থা নিচের থেকেও খারাপ।রজত পিছনে ঘুরতেই দেখলো সায়ন চিন্ময়কে খুঁজছে।রজত জিজ্ঞাসা করলো, ও কোথায় ? এই তো পিছনে ছিল।আর ঠিক তখনই সামনের দিক থেকে চিন্ময়ের চিৎকার শোনা গেল, টর্চের আলোয় ওরা দেখলো সামনের একটা ঘর থেকে চিন্ময়কে অদৃশ্য কিছু একটা টেনে হিঁচড়ে অন্য ঘরে নিয়ে যাচ্ছে।ওদের শিরদাঁড়া বেয়ে হিমেল স্রোত বয়ে গেল,এ দৃশ্য যে দেখতে হবে স্বপ্নেও ভাবেনি ওরা।এটা কী দেখলো ওরা ? এও সম্ভব। কিন্তু চিন্ময়ের আরও জোরালো তীক্ষ্ণ মরণ চিৎকারে সম্বিত ফিরে পেল সায়ন ও রজত, দুজনেই দৌড়ালো চিন্ময়ের উদ্দেশ্যে। সেই ঘরের ভেতরে ঢুকে ওরা দেখলো কিছুই নাই,কোথায় চিন্ময় ? এইমাত্র তাহলে কাকে দেখল ওরা ? এ কেমন ভোজবাজির খেলা।ওরা কি ভুল দেখলো ? এবার ওদের ভয় করতে শুরু করলো। আবারও চিন্ময়ের গলার আওয়াজ শুনতে পাওয়া গেল কিন্তু সেটা দোতলার আরও ভেতর থেকে এসেছে, ওরা ঘর থেকে বেরোতেই

যাবে কিন্তু তখনি দরজাটা প্রচন্ড শব্দে বন্ধ হয়ে গেল। শরীরের সমস্ত লোম খাড়া হয়ে উঠলো ওদের। পরক্ষনেই শুনতে পেলো বাইরে করিডোরে কে যেন লোহার কিছু একটা দিয়ে মেঝেতে ঠুকতে ঠুকতে এগিয়ে আসছে।রজত অস্ফুট কণ্ঠে বলে উঠলো, মুংরি ? ভয়ে রজত আর সায়নের হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে গেল। মনে পড়লো মহিলার কথা।হা ঈশ্বর ! সেই বয়স্ক মহিলাটির কথাগুলো কি সত্যি? মুংরি নামে কোনো প্রেতেরে অস্তিত্ব আসলে আছে এই বাংলোয়।কিছুক্ষণ পরে সব চুপচাপ।খানিকক্ষণ পরে দরজা খুলে গেল নিজে থেকেই, আবারও চিন্ময়ের চিৎকার শুনতে পাওয়া গেল। সেই চিৎকারের রেশ ধাওয়া করে তড়িঘড়ি দৌড়ালো সায়ন আর রজত, সামনেই প্রকান্ড এক বড়ো হলঘরে এসে থামলো দুজন। ততক্ষনে চিৎকার থেমে গেছে, আরো একটু এগিয়ে যেতেই সায়ন পড়ে গেল কিছু একটায় ধাক্কা খেয়ে। টর্চের আলো টা পায়ের কাছে ধরতেই ওরা দুজন ভয়ার্ত কণ্ঠে আর্তনাদ করে উঠল, ওদের পা কাঁপতে শুরু করেছে, কপালে ফুটে উঠেছে বিন্দু বিন্দু ঘাম। চোখের সামনে দেখছে ভয়ংকর এক নারকীয় দৃশ্য। চিন্ময়ের নিথর দেহ পড়ে রয়েছে সেখানে।শরীরটা ছিন্ন ভিন্ন, সারা মেঝে রক্তে ভেসে যাচ্ছে, মুন্ডুটা নেই। সারা শরীর কেউ যেন শাবল দিয়ে কুপিয়েছে।সায়ন সংশয়ের সাথে বলল,আমাদের আদেও চিন্ময় ডাকতে গিয়েছিল ? নাকি ওটা মুংরির কোনো ছল ছিল।এখানে এসে মস্ত বড় ভুল করে ফেলেছি রে রজত। তখনই বারান্দার উল্টো দিকের ঘরটা থেকে একটা বিকট পৈশাচিক হাসির শব্দ ভেসে এল।রজত বলল, চল এখুনি পালাই।সায়ন বলল, না দাঁড়া আমার ফোনটা ওই ঘরটায় মনে হয় পড়ে গিয়েছে।রজত বলল, যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই সন্ধ্যা হয়।সায়ন বলল, তুই এখানেই দাঁড়া। আমি চট করে আসছি, অবস্থা কিছু খারাপ বুঝলে হাঁক দিস।এই কথা বলে সায়ন গিয়ে সেই ঘরে ঢুকে পড়লো।রজত ঘরটার সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভয়ে কাঁপতে থাকলো।কতক্ষন হয়েছে তা ঠিক জানেনা রজত। খানিকক্ষণ পর সায়ন দরজা খুলে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। কিছু না বলে রজতের সাথে সিঁড়ির দিকে হাঁটতে আরম্ভ করলো। রজত বলল, ভাই তাড়াতাড়ি পা চালা, এখান থেকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বেরিয়ে পড়া ভালো। কিন্তু সায়ন হ্যাস হ্যাসে গলায় বলল, আরে বেরিয়ে কোথায় যাবি। আমার সাথেই থেকে যা আজীবন এখানে। রজত এই অদ্ভুত কথা শুনে পিছনে ঘুরল, দেখলো সায়ন নাই। রজত আরও আশ্চর্য হল যখন সে দেখল সায়ন এই সবেমাত্র দরজা খুলে ঘর থেকে বেরিয়ে আসছে। মনে প্রশ্ন জেগে উঠলো, তাহলে এতক্ষন কার সাথে ও হাঁটছিলো ? কার সাথে কথা বলছিলো ? তারপর খেয়াল করলো তাকে দেখে সায়ন কেমন ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।এক অজানা আতঙ্কে রজত পিছনে ঘুরে তাকালো। দেখলো, ঘোর কালো একটা নারী অবয়ব দাঁড়িয়ে আছে।তার লম্বা লম্বা চুল অনবরত হাওয়ায় উড়ে চলেছে, চোখ গুলো ঘোর রক্তবর্ণ, হাত গুলো লম্বা হয়ে তার দিকেই এগিয়ে আসছে, হাতের নখ গুলো যেন কেঁচোর মতো কিলবিল করছে, তার মুখ থেকে বেরিয়ে আসছে একটা লম্বা জিভ, পুরো শরীরটা আগুনে পুড়ে গেছে। রজত ভয়ার্ত কণ্ঠে চিৎকার করে উঠলো। রজতের আর বুঝতে বাকি রইল না এটাই সেই আগুনে পুড়ে মারা যাওয়া মেয়েটির প্রেত, মুংরি। রজত পালাতেই যাবে এমন সময় সেই অশরীরী তার দুই হাত দিয়ে রজতের গলা চেপে ধরলো, রজত শত চেষ্টা করেও ছাড়াতে পারছে না নিজেকে, সায়ন ছুটে এল সেই মুহূর্তে, সেও সেই অশরীরীর শরীর ধরে টানাটানি করতে লাগলো, কিন্তু কোনো লাভ হলো না। আস্তে আস্তে রজতের দম বন্ধ হয়ে আসতে শুরু করলো, বুকটা যন্ত্রনায় ফেটে যাওয়ার উপক্রম হলো তার। কিন্তু খানিক পড়েই রজতকে প্রায় বহু দূরে ছুঁড়ে ফেললো সেই অশরীরী, রজত প্রচন্ড ব্যাথা অনুভব করলো মাথার পিছনে। একটু পরেই সায়ন এল ওর কাছে। কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, হঠাৎ কোথায় যেন অদৃশ্য হয়ে গেল। কিন্তু পরক্ষনেই কানে এল সেই মাটিতে শাবল ঠোকার শব্দ। বিপদ বুঝে ওরা সেই হলঘরে ছুটে গিয়ে একটা অন্ধকার কোণায় গা ঢাকা দিল। কিন্তু মুংরি ওদের দিকে এল না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যখন দুজনে হাঁফ ছাড়ছে ঠিক তখন রজত দেখলো কি যেন একটা গোলাকার বস্তু তার পায়ের কাছে গড়িয়ে এল। ধস্তাধস্তিতে ওদের টর্চ কোথায় হারিয়ে গেছে। সায়ন ঘরটা থেকে ফোনটা পেয়ে গিয়েছিল,তাই সে ফোনের আলো জ্বেলে রজতের পায়ের কাছে তুলে ধরতেই রজতের বমি বেরিয়ে এল। কারণ ওটা আর কিছু নয় বরং চিন্ময়ের কাটা মুন্ডুটা। সায়ন রজতের হাত ধরে মারলো হ্যাঁচকা টান, দৌড়াতে লাগলো ওরা প্রাণ বাঁচানোর আশায়। পিছন থেকে ভেসে আসছে সেই অশরীরীর পৈশাচিক অট্টহাসি।ওরা আরও জোরে দৌড়াতে থাকলো। সিঁড়ি দিয়ে নেমে একতলায় আসতেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল

ওরা। দরজা বন্ধ, কিন্তু এ কী করে সম্ভব ? যখন ওরা প্রবেশ করেছিল তখন একটা পাল্লা ভেঙ্গে পড়ে গিয়েছিল। কি করবে ওরা বুঝতে পারছে না, ঠিক এমন সময় রজতের মাথায় দু ফোঁটা কি যেন পড়লো। হাত বুলিয়ে ফোনের আলোয় হাত টা দেখতেই বাকরুদ্ধ হয়ে গেল রজত। আতঙ্কে ও মাথার উপরে তাকালো, তারপরেই যা দেখলো তার ফলে ওর হৃদস্পন্দন বন্ধ হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হলো। সিলিং এর সাথে টিকটিকির মতো কিন্তু সম্পূর্ণ উল্টো করে শাবল হাতে চিটে আছে সেই অশরীরী অর্থাৎ মুংরি। তার শরীরের পোড়া ক্ষতস্থান থেকেই রক্ত রজতের মাথায় এসে পড়েছে। চিৎকার করে উঠলো রজত, প্রচন্ড ভয়ে। দেখলো সিলিং থেকে দেওয়াল বেয়ে সে ওদের দিকেই আসছে। সায়ন আর রজত শরীরের সমস্ত জোর একত্র করে দৌড়ে দরজার কাছে এগিয়ে গেলো। কিন্তু পারলো না কারণ মুংরি ওদের মতো মানুষ নয় সে একটা অশরীরী তাই সে অধিক ধূর্ত। মূহুর্তে সে ঝাঁপিয়ে এসে ওদের পথ আগলে দাঁড়ালো।

কিছু বুঝে উঠবার আগেই সে শাবলটা তুলে ধরে প্রচন্ড বেগে সায়নের মাথায় আঘাত করলো। নারকেল ফাটার মতো একটা আওয়াজ হলো, সায়নের মাথাটা ফেটে গিয়ে গলগল করে রক্ত বেরোতে শুরু করলো। প্রচন্ড যন্ত্রনায় মাটিতে পড়ে ছটফট করতে শুরু করলো সে। তারপরেই সেই অশরীরী শাবল তুলে রজতকে মারতে উদ্যত হলো কিন্তু রজত সঠিক সময়ে নীচু হয়ে গেল। তার ফলে শাবলের আঘাত লাগলো দরজায় এবং দরজার দুটো পাল্লাই ভেঙ্গে পড়ে গেল। সেই সুযোগে বাইরে বেরিয়ে এলো রজত। মুংরি কিন্তু বাইরে এল না বরং রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে সে প্রবল বেগে সায়নের মাথা লক্ষ্য করে শাবলটা গেঁথে দিল, তারপর উপরে নিল ওর মাথাটা। সায়নের ছটফট করতে থাকা দেহটা মুহূর্তে নিথর হয়ে গেল। সেই দৃশ্য দেখে ভয়ে ও হতাশায় কাঁদতে কাঁদতে রজত দৌড়ে বেরিয়ে এলো রাস্তায়। তখনও ঘর থেকে ভেসে আসছে সেই প্রেতাত্মার পৈশাচিক হাসি।

দশঘরা (১) গ্রাম পঞ্চায়েত

(ধনিয়াখালি পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত)

মানবিক পরিষেবা প্রদানের মাধ্যমে সকলের সার্বিক উন্নতি সাধনই আমাদের লক্ষ্য।
'কন্যাশ্রী'র সাফল্যে উদ্ভাসিত আমরা । নির্মল পঞ্চায়েত ও পানীয় জলের নিরাপদ সুরক্ষা প্রদান আমাদের উদ্দেশ্য।
'শিক্ষাশ্রী', 'রূপশ্রী' ও 'মানবিক' প্রকল্পের মাধ্যমে সহায়তা সুনিশ্চিত করা আমাদের একান্ত কাম্য।
'কৃষক বন্ধু' ও 'খাদ্য সাথী' প্রকল্পের মাধ্যমে আর্থিকভাবে দুর্বল পরিবারগুলিকে স্বনির্ভরতা প্রদান আমাদের লক্ষ্য।

শংকর কুমার সাহা
উপ প্রধান

চম্পা বাউড়ী
প্রধান

দয়াশঙ্করের ভূত দর্শন

মিঠুন মুখার্জী

তখন শীতকাল।পাঁচটার মধ্যে সন্ধ্যা হয়ে যেত।অফিস থেকে ফিরতে দয়াশঙ্করের রাত আটটা বাজত। শীতকালে রাত আটটা মানে অনেকটাই রাত। গরমকালে রাত নটার সময় রাস্তায় লোক থাকলেও শীতকালে রাত আটটাতেই রাস্তায় তেমন লোক দেখা যায় না।বোলপুর স্টেশন থেকে সাইকেলে চেপে দয়াশঙ্কর প্রতিদিন বাড়ি যেতেন।কখনো সঙ্গে দু-একজন সঙ্গী পেয়ে যেতেন, আবার কখনো একা একা যেতে হতো। দুই-তিনজন একসঙ্গে বাড়ি ফেরার সময় কোনো সমস্যা ছিল না। কিন্তু যেদিন একা একা বাড়ি ফিরতেন তিনি, সেদিন ভয়ে সারা শরীর আড়ষ্ঠ হয়ে যেত। ফেরার সময় নির্জন পথে কোনো কিছুর শব্দ শুনলে প্রচন্ড ভয় পেতেন তিনি।এমনি রাজা-মহারাজাদের মতো মুখে লম্বাচওড়া কথা,শুনলে মনে হবে দয়াশঙ্করের মতো সাহসী ব্যক্তি কম আছে,কিন্তু ভূতের ভয়ে তার জ্বর চলে আসে। তার অফিস ব্যাগে একটি বড় টর্চলাইট ও গীতা সবসময়ের জন্য থাকত। তার বিশ্বাস ছিল গীতা সঙ্গে থাকলে কোনো ভূত-প্রেত তাকে স্পর্শ করতে পারবে না। গলায় পৈতে থাকায় মাঝে মাঝে একা বাড়ি ফেরার সময় ভয় পেয়ে আহ্নিক জপ করতেন তিনি। কোপাই নদী রেখে কিছুটা গেলেই তার বাড়ি। নদীর ধারেই ছিল একটি অতি প্রাচীন শ্মশান।প্রায় দুই শত বছর আগে এখানকার জমিদার এই শ্মশানটি নির্মান করেছিলেন।এখান থেকে খুব সহজেই কংকালীতলা মায়ের মন্দিরে যাওয়া যায়।সতী মায়ের একান্ন পিঠের মধ্যে এটি একটি।

কোপাই নদীর পাশের শ্মশানে সন্ধ্যার পর থেকে তেমন কারো দেখা পাওয়া যায় না। শ্মশান কালীর পুজো করে পুরোহিত সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টার মধ্যে বাড়ি চলে যান। তাই দয়াশঙ্করের একলা ফেরার দিন পুরো রাস্তাটা থাকে নির্জন। আশে-পাশে তেমন জনবসতি নেই বললেই চলে। খুব ভয় পায় সে। কিন্তু সংসারের কথা চিন্তা করে অন্য কোন কাজও করতে পারেন না তিনি। যেখান থেকে সন্ধ্যা নামার আগে ঘরে ঢুকে যেতে পারেন। তাছাড়া এই পঞ্চাশ বছর বয়সে অন্য কোথাও কাজ পাওয়ার তার সম্ভাবনা নেই। তাই নিরুপায় হয়ে এই কাজ করা ছাড়া তার উপায় ছিল না।

একদিন অমাবস্যার রাতে একা একা সাইকেল চালিয়ে দয়াশঙ্কর বাড়ি ফিরছিলেন। তখন রাত আটটা বাজে। বোলপুর স্টেশন থেকে কিছুটা আসার পর তিনি অনুভব করেন তার পিছন পিছন কে যেন আসছেন। নূপুরের শব্দ তার কানে আসতে থাকে। এক হাতে সাইকেল শক্ত করে ধরে অন্য হাতে টর্চটি মেরে মনে মনে কৃষ্ণ নাম জপ করতে থাকেন।হঠাৎ তাঁর সামনে একটি বাঁশ ভেঙে পড়ে। তিনি খুবই ভয় পেয়ে যান। সাইকেল দাঁড় করিয়ে তিনি টর্চ মেরে ভয়ে কাঁপতে থাকেন। ঠাকুরমার কাছে ছোটবেলায় তিনি শুনেছিলেন এই বাঁশ ডিঙিয়ে যেতে নেই, তবে বিপদ বাড়ে। তাই তিনি বাঁশ ডিঙিয়ে না গিয়ে খানিকটা ঘুরে সাইকেল নিয়ে যান। হঠাৎ একটা চিকন গলার কথা তাঁর কানে ভেসে আসে --'' এযাত্রা বেঁচে গেলি, বাঁশ ডিঙিয়ে গেলেই তোর ভবলীলা সাঙ্গ করে দিতাম।'' এই বলে হি হি করে হেসে ওঠে। দয়াশঙ্কর প্রচন্ড ভয় পেয়ে যান। সামনে শ্মশানের চিন্তা করে সারা শরীর ভয়ে কেঁপে ওঠে তার। সাইকেল চালিয়ে যেতে যেতে দয়াশঙ্কর দেখেন তার সামনে রাস্তা দিয়ে একজন ব্যক্তি মাথায় একটা ঝুড়ি নিয়ে যাচ্ছে। ঝুড়ির মধ্যে কী আছে অন্ধকারে তা দেখা যাচ্ছে না। তিনি টর্চের আলো লোকটির গায়ে মেরে বলেন --- '' ও ভাই শুনছেন? আপনি এদিকে কোথায় যাবেন? আপনাকে তো এদিকে কোনো দিন দেখি নি! কোথায় বাড়ি আপনার?'' দয়াশঙ্করের প্রশ্নের জবাবে ঐ আগন্তুক ব্যক্তি বলেন--- ''আপনি আমায় চিনবেন না। আমার বাড়ি কংকালীতলা থেকে কিছুটা দূরে। এই পথে আমি সেরকম যাতায়াত করি না। আজ তাড়া থাকায় এই ভিতরের পথ দিয়ে বাড়ি যাচ্ছি। কোপাই নদীর পাশের শ্মশানে আমি অনেকবার এসেছি শব দাহ করতে। এই দিকটা আমার চেনা।'' আগন্তুকের কথা শুনে দয়াশঙ্কর পুনরায় বলেন --- ''আপনি কী করেন? আর এতরাতে কোথা থেকে আসছেন? এই ঘন অন্ধকারে আপনি পথ দেখে যাচ্ছেন কীভাবে? আর আপনার ঝুড়ির মধ্যে কী আছে?'' আগন্তুক বলেন--- '' আমি একজন কৃষক। হাট করে বাড়ি ফিরছি।

বিকেলে গিয়েছিলাম কিছু সব্জি নিয়ে। আর অন্ধকারে পথ চলা আমার অভ্যাস হয়ে গেছে। কোনো অসুবিধা হয় না।"

দয়াশঙ্করের এই ব্যক্তির কথাগুলো কেমন যেন বিশ্বাস হয় না। সাইকেল চালিয়ে যেতে যেতে ঝুড়িতে টর্চ মেরে তিনি দেখেন, একটি মানুষের মাথা ঝুড়ির মধ্যে বসানো। ভয়ে তিনি বাকরুদ্ধ হয়ে যান। এই বিপদে কী করবেন বুঝে উঠতে পারেন না। তিনি যে ভূতের সঙ্গে চলেছেন তা বুঝতে তার আর দেরি হয় না। আগন্তুক ব্যক্তিটি এরপর যতই কথা বলুক, ততই তিনি চুপচাপ থাকেন। তারা শ্মশানের সামনে এলে আগন্তুক ব্যক্তি দয়াশঙ্করকে বলে --- "আপনি এখানে একটু দাঁড়ান। আমি শ্মশানের ভিতর থেকে আসছি। আসলে আমাদের গ্রাম থেকে আজ একটা শব দাহ করতে অনেকে এসেছে। আমি একবার ওদের দেখা দিয়ে আসি।" আগন্তুক ব্যক্তিটি শ্মশানে ঢুকে গেলে দয়াশঙ্করের মনে হয়, একবার দেখি তো শ্মশানে কোনো মড়া পুড়ছে কি না। আড়াল থেকে দয়াশঙ্কর দেখেন শ্মশানে কোনো মড়া পুড়ছে না। ওই আগন্তুক তার ভূতরূপ ধরে ঝুড়ির মধ্যে থাকা মানুষের মাথাটা চিবিয়ে খাচ্ছে। সঙ্গে আরও পাঁচ-ছয়জন ভূত রয়েছে। তারাও এই খাবারে ভাগ বসিয়েছে। আগন্তুক ভূতটি সঙ্গে থাকা ভূতেদের বলছে --- "এখন তোরা এইটুকু প্রসাদে সন্তুষ্ট থাক। আজ শ্মশানে কোনো মড়াও আসে নি। তবে চিন্তা করিস না তোরা, বাইরে আমি একজনকে দাঁড় করিয়ে রেখে এসেছি। কিছুক্ষণের মধ্যে ওকে জবাই করে আমি শ্মশানে নিয়ে আসছি। টাটকা মাংস ও রক্ত পাবি তোরা। পেট ভরে সবাই খাস। আমাকে এক্ষুনি যেতে হবে নতুবা মিস হয়ে যাবে।" আগন্তুকের এই কথাগুলো শুনে দয়াশঙ্কর আর একমুহূর্ত বিলম্ব না করে সাইকেলে উঠে বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হন। রাম নাম জপ করতে করতে মুহূর্তের মধ্যে বাড়ির সামনে এসে চিৎকার করে পড়ে যান এবং জ্ঞান হারান। তার গলার আওয়াজ শুনে বাড়ির ভিতর থেকে কয়েকজন আলো নিয়ে বেরিয়ে আসেন। দয়াশঙ্করের বউ দেখেন, দয়াশঙ্কর অজ্ঞান হয়ে পড়ে রয়েছেন। ঘর থেকে জল এনে তার চোখে মুখে ছিটালে দয়াশঙ্করের জ্ঞান ফেরে। জ্ঞান ফিরলে ভূত ভূত বলে চিৎকার করে বউকে জড়িয়ে ধরেন তিনি। তিনি আরো বলেন --- "আমায় মেরে ওরা রক্তমাংস খাবে। আমায় মেরে ফেলবে। তোমরা আমায় বাঁচাও।" অনেক বোঝানোর পর দয়াশঙ্কর ঠান্ডা হন। চোখ খুলে দেখেন সত্যিই কেউ নেই।

এদিকে ঐ আগন্তুক ভূতটি তার আসল রূপ ছেড়ে আবার আগন্তুক ব্যক্তির বেশ ধরে শ্মশানের বাইরে বেরিয়ে আসে। এসে দেখে সেখানে দয়াশঙ্কর নেই। সে চলে গেছে বুঝতে পেরে একটা বিরাট হাওয়ার কুন্ডলী পাকিয়ে নিমেষে আগন্তুক দয়াশঙ্করের বাড়ির সামনে চলে যায়। সেখানে অনেককে দেখে সে আর এগোয় না। বলে --- " এবার তুই বেঁচে গেলি। পরেরবার আর তোকে সুযোগ দেব না। প্রথম ছলনায় তোকে জবাই করব। বেঁচে নে এই কদিন।"

ভূতের ভয় পেয়ে দয়াশঙ্কর প্রচন্ড জ্বরে পড়ে। ডাক্তার দেখিয়ে এক সপ্তাহ পর সুস্থ হয় সে। বাড়ির লোকেরা তার মুখে সমস্ত ঘটনা শুনে অবাক হয়ে যান। তাদের কথা মতো দয়াশঙ্কর কাজটি ছেড়ে দিয়ে এলাকায় একটা কাজ নেন।

পাঁচড়া গ্রাম পঞ্চায়েত

(জামালপুর পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত)

আমাদের অঙ্গীকার–

সর্বশিক্ষা, সর্বস্বাস্থ্য ও মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠী সহ পঞ্চায়েত সমিতির বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ, রূপায়ণ সহ সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিকে সফল করতে সততা, নিষ্ঠা, দ্রুততা ও দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালনে আমরা দায়বদ্ধ।

সাবিত্রী টুডু
উপ প্রধান

বিকাশ পাকড়ে
প্রধান

মালবাবু

সুব্রত মিত্র রানা

ভাবতেই পারেন বানিয়ে বানিয়ে মিথ্যে লিখছি। সেটা নেহাতই আপনার অধিকার।

তবে লিখতে পড়তে না জানা মুখে মুখে ছড়া কাটা এক আশ্চর্য মানুষ মালবাবু। নিজের পরিচয় দেন এভাবেই --

জলের মাছ ডাঙায় তোলেন
তোলেন ক্ষেতের পটল
জমাতে চান পয়সা টাকা
অভাব নামের ফাটল...
যতই খাটেন কতই খাটেন
সন্ধ্যে রাতে দিনে
এটা সেটা বেচেও দেন
সখের জিনিস কিনে
-- জর্জরিত ঋণে

মাঝরাতে উঠে জেলে পাড়ার রঘুনাথ কোটালের টিমে জাল টানতে যান।অন্য সময় জমি জিরেতের কাজে।বিরাম কিছু নেই বললেই চলে। বাকি সময় কাটে ঝুড়ি পেতে বুনে।খাটিয়ে মানুষ। আয় মন্দ না।ব্যয় বেশি।বড় সংসার।

খাটা খাটনির শরীরে একটু আধটু মদ না খেলে চলে না এমন লোক বিরল।সে দিক থেকে তিনি বিরলতম বটে। বরং মালবাবুর অন্তঞ্জমিলের নেশা বড় ছোঁয়াচে।প্রথম পরিচয়েই আমি তাঁর প্রেমে পড়ি,সেকথা বহু দিনের।

কথায় কথায় তার কথা উঠতেই,ও গাঁ থেকে আসা একজনকে যেই জিগ্যেস করেছি, চেনেন নাকি তাকে ? অমনি চটজলদি জবাব --

না নেই কোনো নেশাই তার
চালবাজও নন মোটে
চলতে ফিরতে কথার টানে
ইয়ার বক্সি জোটে...
কে না জানে অবস্থা তার,
জানে হাঁড়ির হাল
-- মেঘনাদ মাল।

নিরক্ষর হলে কি হবে,দেশের খবর রাখেন দশের থেকে। কোন্ কাগজ কি লিখছে, কোন্ চ্যানেল কি বলছে আবহাওয়ার খবর কি,সব।

তারা ঝলমল রাতের আকাশ, আচমকা ভোরবেলা ধারাপাত শোনালে,তিনি বলে ওঠেন --

রেতের বেলা তাকিয়ে দেখি
আকাশ জুড়ে ছেঁদা
ভোরবেলা তাই টপ টপিয়ে
রাস্তা হল কাদা।

হাড় ভাঙা খাটনি।অভাবের সংসার।এসবের মধ্যে থেকেও তিনি নেই।অন্তঞ্জ মিলের নেশায় বুঁদ।কখনও আবার গান ধরেন মনের আনন্দে।প্রতিবেশীর কেউ এত খুশির কারণ জানতে চাইলে বলেন --

গোঁফ জোড়াতে রঙ ধরেছে
মাথার চুলও সাদা
তাই বলে কি মনেরও
বয়স পেরোয় পনের ?
সকাল সকাল গান বেঁধেছি
নিধা পামা পাধা ...

অন্যকে ভালো বাসতে পারেন বলেই পরের দুঃখে ঢুকরে ওঠে তাঁর ছড়া।সামাজিক অন্যায়,অসংগতি,নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে শ্লেষও ঝরান।এই তো সেদিন,কায়েত পাড়ার এক একলা বৃদ্ধার মৃত্যুকে কেন্দ্র করে ছড়া কাটলেন --

চুল্লি হাসে শ্মশান হাসে
হাসেন মা গঙ্গো !
একলা গ্রামে মা মরলো
ছেলে ফিরল বঙ্গ
-- স্মার্ট এবং শিক্ষিত বেশ
ধন্য মা-টি পুণ্য দেশ !

বলতে দ্বিধা নেই,সমবয়সী হলেও আমার সখা,আমার প্রিয়,মেঘনাদ মালই আমার গুরু।তাঁর ছোঁয়াচেই ছড়া লেখার শুরু এ অধমের।তার সাথে দেখা না হলে - 'পণের অতি বৃহৎ লিস্ট/বরের বাবা কমিউনিস্ট ' - এর মত ছড়া কোনও দিনই লিখতে পারতাম না।৪ -ঠা সেপ্টেম্বর ১৯৭২ তাঁর জন্মদিন।তাঁকে আমি যত ভালোবাসি,এত্ত ভালো বউকেও নয়।

অনুগল্প

শারদীয়ায় পুনর্মিলন

চন্দ্রানী মজুমদার

তিন বান্ধবী- শ্রীময়ী, শুক্লা ও প্রজ্ঞা প্রায় ১০ বছর বাদে দেখা করছে এই শারদীয়ার পঞ্চমীতে। মিটিংটা ফিক্স হলো শুক্লার বাড়িতে। শ্রীময়ী জিজ্ঞেস করলো - ‘‘কিরে কেমন আছিস তোরা..? ইউনিভার্সিটি থেকে পাশ আউট হওয়ার পর প্রায় ১০ বছর বাদে দেখা হলো আমাদের’’। শুক্লা বললো - ‘‘হ্যাঁ রে। এতদিন তো তোরা কেউ কলকাতা শহরেই ছিলিনা। কখনো বাড়ি ফিরলে কেউ দেখাও করতিস না। তাই এতো বছর দেখাও হয়নি কাউর সাথে। প্রজ্ঞা বলতে শুরু করলো - ‘‘সেই যে ১০ বছর আগে আমরা ইউনিভার্সিটি থেকে বেরোনোর ১ বছর পর আমি চলে গেলাম ইউ. এস. এ. চাকরি করতে। আর শ্রীময়ী বিয়ে করে বেঙ্গালুরুতে সেটেল হলো। একমাত্র শুক্লা রয়ে গেলি এই কলকাতায়। শুক্লা বললো - ‘‘হ্যাঁ, আমি কলকাতায় থেকেই একটা চাকরি পেলাম, তারপর বিয়ে করলাম। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য বিয়ের দুই বছর বাদেই আমার হাসব্যান্ড সোহম মারা গেলো কার অ্যাক্সিডেন্টে। এখন আমি বড়ই একা জীবনে। শ্রীময়ী শুক্লার দিকে তাকিয়ে বললো -‘‘কে বলেছে তুই একা..? আমরা আছি তো। আমি তো ডিভোর্স হওয়ার পর কলকাতায় চলে আসলাম পার্মানেন্টলি। এখানে একটা চাকরিও পেয়ে গেছি, আর কোনো চিন্তা নেই’’। প্রজ্ঞা বলতে থাকলো - ‘‘আমার তো বিদেশে গিয়ে বিয়েই হলোনা,অনেক বয়সও হয়ে গেছে। আর রিসেন্টলি কলকাতায় পোস্টিং করিয়েছি। তাই আর ফিরে যাওয়ার প্রশ্ন নেই’’। এবার থেকে আমরা একসাথেই থাকবো আর নিজেদের সব প্রব্লেম শেয়ার করবো। কি বলিস তোরা..??

শুক্লা বললো -‘‘হ্যাঁ, খুব ভালো হবে সবাই একসাথে থাকলে। সেই কলেজ, ইউনিভার্সিটির মতন আবার আমাদের পুনর্মিলন ঘটলো। শ্রীময়ী বললো -‘‘চল, তাহলে এবারে দুর্গাপুজোর দিন গুলো তিনজন একসাথে ঘোরাঘুরি করি আর খুব খুব এনজয় করি।’’ প্রজ্ঞা বললো -‘‘লেটস স্টার্ট বাডি। আই এম রেডি’’।

শারদীয়ার শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন

সন্টু দাস

ভৈরবপুর,
জামালপুর,পূর্ব বর্ধমান

খবর সোজাসুজি

প্রতিনিয়ত খবরের আপডেট পেতে ফলো করুন আমাদের ফেসবুক, ইউটিউব, ট্যুইটার এবং ইন্সটাগ্রাম।

Follow Us :
facebook.com/khaborsojasuji
youtube.com/@khaborsojasuji
twitter.com/Khaborsojasuji
instagram.com/khaborsojasuji
www.khaborsojasuji.com

বিষাদময় এক চৈত্র দিনে

লাজবী মুখার্জী

বাতাসে যখন বসন্তের বিদায়ের করুণ বার্তা ছড়িয়ে পড়েছে,কাঞ্চন ফুল যখন সময়ে আবারও ফিরে আসার ভরসা জাগাচ্ছে,মেঘের আড়াল থেকে একফালি চৈত্র যেন ঠিক কৈশোরের বালক, বালিকার ন্যায় লুকোচুরি খেলছে ! প্রকৃতি যেন এভাবেই প্রতিনিয়ত শুরু ও শেষের গল্প রচনা করে চলেছে ! এতক্ষণ এই কথাগুলোই মনে মনে ভাবছিল শুভ্রা।ট্রেনের জানলার ফাঁক দিয়ে আকাশকে দেখতে দেখতে কত কথাই যে মনে আসে ! এভাবেই রোজ স্কুলে যাবার পথে প্রকৃতির নিত্যনতুন রূপকে অবলোকন করে শুভ্রা।আজ বছর বারো হল শুভ্রা স্কুলে শিক্ষকতা করছে। বাড়ি থেকে স্কুলে যেতে অনেকটা সময় লাগে।

দীর্ঘ এই পথে কখনো বই, কখনো গান,কখনো আবার প্রকৃতি এই জীবন বিজ্ঞানের শিক্ষিকার সঙ্গী।চৈত্র প্রকৃতির বুকে পা রাখতে না রাখতেই তার অস্তিত্ব জানান দিতে শুরু করেছে।প্রচণ্ড এই গরমে শুভ্রার এতটা দূরের পথ পেরিয়ে শিক্ষকতা করতে যাওয়া শুধু যে জীবিকার টানে তা নয় বরং খানিকটা ভালোলাগা আর খানিকটা নিজেকে পুরোনো স্মৃতির ভিড় থেকে দূরে রাখা !

স্কুলে পৌঁছানো মাত্রই শুভ্রার আর দাঁড়ানোর সময় থাকেনা ! একের পর এক থিওরি ক্লাস ! প্রাকটিক্যাল ক্লাস ! সব মিলিয়ে শুভ্রা ম্যাডামের একেবারে নাস্তানাবুদ অবস্থা হয় প্রতিদিন।তবে আজ সেই রকম চাপ নেই শুভ্রার মাত্র তিনটি ক্লাস ছিল কারণ আজ শুভ্রার স্কুলের একজন বয়স্কা শিক্ষিকা অবসর গ্রহণ করবেন। আর তাই বিদায় বেলায় তাকে একটু ভালোবাসায় ভরিয়ে দিতে আজ স্কুলে বসবে এক ছোটখাটো জলসা।

আজ যেন শুভ্রার অখণ্ড অবসর তাই আজ স্কুলের প্রতিটি কোণাকে একটু ভালোভাবে অবলোকন করতে ইচ্ছে হচ্ছে শুভ্রার। টিচার রুমের জানলা থেকে শুভ্রা দুচোখ ভরে দেখছে সবুজ মাঠে ধুলো উড়িয়ে শিশুরা খেলার মাধ্যমে মেতে উঠেছে একে অপরের সাথে উচ্ছ্বাসে।চৈত্রের তপ্ত দুপুরের রোদও যেন ওদের শিশু সুলভ সারল্যকে আলিঙ্গনে ভরিয়ে তুলছে।শুভ্রার এক টুকরো কিশোরী বেলা যেন দুহাত বাড়িয়ে হাতছানি দিয়ে ওকে ডাকছে। দুই বন্ধুর কাড়াকাড়ি করে কাঁচা আম মাখা খাওয়া দেখতে দেখতে হঠাৎ শুভ্রার চোখের কোণটা যেন ভিজে আসছে।কোথাও যেন অতীতের স্মৃতি তাঁর সামনে জীবন্ত হয়ে ধরা দিচ্ছে।বাল্যবন্ধু ও চিরসখা শাশ্বতর মুখটা আজ বড্ড মনে পড়ছে।কানে যেন বার বার বেজে উঠছে শাশ্বতর কথাগুলো - '' প্রহর শেষের আলোয় রাঙা সেদিন চৈত্রমাস তোমার চোখে দেখেছিলাম আমার সর্বনাশ।''

এমন এক ভরা চৈত্র দিনেই শাশ্বতকে নিজের জীবন থেকে হারিয়ে ফেলেছিল শুভ্রা তাই তো চৈত্র তার কাছে সর্বনাশী আর এই ভাবনার রেশ টুকু নিয়ে সময় যেন বইতে থাকে উদাসী বাউলের ন্যায় শুভ্রার চোখের জল যেন চৈতী হাওয়ার মতো বয়ে যায় আর কোথাও গড়ে তোলে স্মৃতির সরণী।।

মাকালপুর গ্রাম পঞ্চায়েত

(পোলবা দাদপুর পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত)

১। নারী শিক্ষার দিশা হল কন্যাশ্রী। এটি একটি আর্থিক উৎসাহদান প্রকল্প, যা আজ সারা বিশ্বে সম্মানিত।
২। বাল্যবিবাহ রোধ করে কন্যাশ্রী।
৩। দরিদ্র মেয়েদের পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়া এবং উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে সাহায্য করে কন্যাশ্রী।
৪। প্রতিটি পরিবারে শৌচাগার মহিলাদের নিরাপত্তার প্রতীক।
৫। আসুন শৌচাগার গড়ি, মনের সুখে ব্যবহার করি।
৬। বিলাব কেন মা বোনের মান, রাখব ধরে ঘরে নারীর সম্মান।

উপ প্রধান
বালিকা রায়

প্রধান
অঞ্জন সিংহরায়

পর্বান্তর

পিনাকী দত্ত

গরুকে জাবনা দেওয়ার জন্য খস্ খস্ শব্দে দ্রুত গতিতে খড় কেটে চলেছে রিমিল হাঁসদা। শেষ বিকেলের রোদ তার মুখের একদিকে পড়ায় মুখটাকে আরও কঠিন কঠোর ও রুক্ষ লাগছে। পরণের গেঞ্জিটা ঘামে ভিজে একদম সপ্ সপ্ করছে। সাপের ফণার মত অনাবৃত হাতদুটো শুধু উঠছে আর নামছে। মুহূর্তের মধ্যে খড়ের আঁটিগুলো টুকরো টুকরো হয়ে বটির দুদিকে ছড়িয়ে পড়ছে । কোনদিকে যেন ওর হুঁশ নেই।

ভটভট্ শব্দ করে একটা মোটরসাইকেল কাছে এসে থামতেই রিমিল নিরাসক্তভাবে শব্দের উৎস সন্ধানে একবার পেছন ফিরে তাকাল। দেখল পাশের গাঁয়ের রমেশ মণ্ডল। একসময় ওদের মধ্যে খুবই ভাব ছিল। তবে আজ রিমিলের মধ্যে কোন হেলদোল দেখা গেল না। ও একমনে নিজের কাজ করতে লাগল।

রমেশ কাছে এসে-আরে শ্যাম, তুই এখনও কাজ করছিস ! হরিপুরে যাবি কখন ?

ওখানে যে বিরাট মেলা বসেছে রে !

তুই শুনিসনি হরিপুরের মুখুজ্জেরা বিরাট ধুম করে জন্মাষ্টমী পালন করছে ?

একান্নজন ঢাকি এসে ঢাক বাজাচ্ছে।

কুঞ্জপুরের রথীন ঘোষের দল এসেছে।

রাতে পালাগান হবে- 'কংসবধ'।

দারুণ ব্যাপার রে !

একনাগাড়ে কথাগুলো বলে চলে রমেশ। ও লক্ষ্যই করল না যে, পালাগানের নাম শোনামাত্রই রিমিলের চোখমুখ কিরকম শক্ত হয়ে গেল। ওর নাক দিয়ে গরম নিঃশ্বাস বের হতে লাগল।

রিমিলকে চুপ করে থাকতে দেখে রমেশ উৎসাহের সাথে বলে চলে, তুইও তো একসময় পালাগানে অভিনয় করতিস রে।

একবার তো 'মহিষাসুরবধ' পালায় মহিষাসুর আর 'ঘটোৎকচবধ' পালায় ঘটোৎকচ সেজেছিলি। দারুণ মানিয়েছিল তোকে। মনে আছে তো তোর ?

আর সেবার 'রাধে-শ্যাম' পালায় শ্যামের ভূমিকায় এমন ফাটিয়ে দিলি যে, তোর নামই হয়ে গেল শ্যাম।

কেন মনে থাকবে না। তোমরা তো চিরটাকাল আমাদের রাক্ষস-খোক্কসরূপেই দেখে এলে।

রিমিলের গলা শুনে চমকে উঠে রমেশ।

বলে- 'তোর কি হয়েছে রে শ্যাম ?'

গনগনে আচে জল পড়লে যেমন ছ্যাৎ করে ওঠে তেমনি রিমিলও ছ্যাৎ করে উঠল।

বলল, আমার নাম রিমিল হাঁসদা। এখন থেকে ঐ নামেই ডাকবে। শ্যাম নামে আগে কেউ ছিল, এখন আর কেউ নেই।

'শ্যাম' নামটা এমনভাবে উচ্চারণ করল যে, নামটার প্রতি চরম বিতৃষ্ণা গোপন করা গেল না।

রমেশ সাদা মনে জিজ্ঞাসা করল, কৃষ্ণ আবার তোদের কি ক্ষতি করল রে ? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।

শ্যামই বলো আর কৃষ্ণই বলো - লোকটা ধুরন্ধর আর নানারকম প্যাচপয়জার কষতে ওস্তাদ ছিল ।

ঐ লোকটা না থাকলে যুধিষ্ঠিরের পরে আমাদের জাতির লোকই সিংহাসনে বসত। আর সেটা যাতে না হয় তাইতো কায়দা করে কর্ণের ঐ মারাত্মক অব্যর্থ প্রাণঘাতী অস্ত্রের সামনে ঘটোৎকচকে এনে দাঁড় করিয়ে দিল।

আবার ঘটোৎকচের ছেলে বার্বারিক এর কথা ভেবে দেখো। ও থাকলে তো কৃষ্ণ এত জারিজুরি দেখানোর সুযোগই পেত না। কিছু সময়ের মধ্যেই খেল খতম্ করে দিত। তাই বার্বারিককে কীভাবে টোপ দিয়ে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগেই সরিয়ে দিল।

এসব ভেবে দেখেছ কখনো ?

ভাব। ভাবা অভ্যাস কর।

রমেশ মাথা চুলকাতে চুলকাতে ভাবতে লাগল। কথাগুলো তো উড়িয়ে দেওয়ার মত নয়।

আর এ ব্যাটা সাঁওতাল হলেও শিক্ষিত সাঁওতাল।

রমেশের বাইক ধুলো উড়িয়ে চলে গেল।

সেই ধুলো ওড়া পথে হয়তো আবার নূতন কোন বার্বারিকের আগমন প্রতীক্ষায় রিমিল নির্নিমেষ চোখে তাকিয়ে রইলো ।

প্রথম দেখা

রঞ্জন কুমার ব্যানার্জী

পয়লা বৈশাখ মানেই বাড়িতে দুর্দান্ত সব পদ রাঁধবে রিক্তা। সুবীরকে ফোনে লিস্ট পাঠিয়েও দিয়েছে। কিন্তু সুবীর একটা কান্ড ঘটাল। এরকম একটা কিছু ঘটাবে তা স্বপ্নেও ভাবেনি রিক্তা। তবে হোয়াটস অ্যাপে দুটো ব্লু-টিক হবার পরও কোনো রিপ্লাই না পাওয়াতে ওর মনে খটকা লেগেছিল। বিষয়টা বুঝতে পারল রাঙামাসির ফোনটা পেয়ে। ওদেরকে নাকি সুবীরই ফোন করেছিল। নেমন্তন্ন পেয়ে রাঙামাসির মেয়ে রুনাই তাকে জানায় যে তারা আগের দিন বিকালেই পৌঁছে যাবে। শুধু রাঙামাসি নয়, সুবীর ফোন করেছিল রিক্তার বাপের বাড়িতেও। বড়মা, ছোটোপিসি সকলকেই আলাদাভাবে ফোন করে নেমন্তন্নটা সেরে নিয়েছিল।

রিক্তা কিছুতেই বুঝতে পারছিল না এইসব খামখেয়ালিপনার মানেটা কী! দুবার ফোন করেছে অফিসে, 'একটু ব্যস্ত আছি, পরে কথা বলব' বলে ফোন কেটে দিয়েছে। আজ ও বাড়ি ফিরুক একটা হেস্তনেস্ত করেই ছাড়বে রিক্তা। পয়লা বৈশাখ মানে পনেরই এপ্রিল; মাসের মাঝখানে এতগুলো মানুষকে নেমন্তন্ন করে খাওয়ানোর ঝক্কিটা যে কতখানি তা বেশ হাড়েহাড়ে টের পাবে ও। প্রায় তিনবছর হয়ে গেল ওদের বিয়ে হয়েছে। বিয়েটা অবশ্য কোনো পক্ষই মেনে নিতে পারেনি। অগত্যা অনুষ্ঠান ছাড়াই গোপনে বিয়েটা সারতে হয়েছিল বাঁড়ুজ্যে বাড়ির রিক্তা ও পালবাড়ির সুবীরকে। তারপর যা হয় আর কী! প্রথম ছ'মাস মুখ দেখাদেখি বন্ধ, পরের বছর পুজোর তত্ত্ব নিয়ে মেয়ের বাড়ি হাজির রিক্তার বাবা-মা।

সাতবছর ধরে দুজন দুজনকে এত নিবিড়ভাবে চিনলেও আজকের ঘটনাটা কিছুতেই বুঝতে পারছিল না রিক্তা। গতবছরও তো ও পয়লা বৈশাখ অনেক কিছু রেঁধে খাইয়েছিল। মেনুটা অবশ্য সুবীর-ই ঠিক করে দিয়েছিল। তাই এবছর চিংড়ির দুরকম পদ, বাসন্তী পোলাও, সুবীরের পছন্দ দই কাতলা আর মিষ্টি মেনুতে লিখে তাকে পাঠিয়েছিল রিক্তা। রোজ দুপুরে টিফিন আওয়ার্সে বাড়িতে ফোন করে সুবীর। সেসময়েই বিস্তারিত আলোচনা করে নেবে ঠিক করেছিল সে। তার মধ্যে রুনাই আর বাপের বাড়ির ফোনগুলো ওকে চমকে দিয়েছিল। হাতে যে আর মাত্র নয় দিন।

অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিল রিক্তা কখন ঘড়ির কাঁটায় সাতটা পনের বাজবে। মোবাইলটা হাতে নিয়ে ফোন করতে যাবে এমন সময় কলিং বেলের আওয়াজ শুনে ছুটে গেল দরজায়। দরজা খুলে চোখের দিকে তাকিয়ে কোনো ক্লান্তির রেশ খুঁজে পেল না রিক্তা, বরং আজ তাকে বেশ হাসিখুশিই দেখাচ্ছিল।তবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অনেক প্রশ্ন করলেও কোনো সদুত্তর সে পায়নি। যতবারই জানতে চেয়েছে একটাই উত্তর; সময় হলেই সব জানতে পারবে। তবে এটুকু জানতে পেরেছে সেদিন পুরো খাওয়া-দাওয়াটাই হবে বাইরে। সে খুব ভালো করে জানে বলবেনা বলে যখন ঠিক করেছে, সুবীরের পেট থেকে কোনোভাবেই আর কথা বার করা যাবে না। খানিকটা আনন্দ, খানিকটা চিন্তা আর বাকিটা কৌতূহল কখন যে সেই রাতে ওর চোখের পাতাগুলো ভারি করে দিয়েছিল জানতেও পারেনি রিক্তা।

আজ পয়লা বৈশাখ। সব অপেক্ষার অবসান হবে আজ। কথামতো আত্মীয়স্বজনরাও প্রায় সবাই এসে গেছেন। সবার মনে একটাই কৌতূহল; ''ব্যাপারটা কী?'' যাইহোক দুপুরে বাড়ির সামনে মিনিবাসে সবাই এসে উঠতেই বাস বর্ধমানের গোলাপবাগ থেকে রওনা দিল পার্কাস রোডের দিকে। ব্লু জিন্স আর হোয়াইট টি-শার্ট পরে সুবীর বসেছিল রিক্তার পাশেই। একদম সামনের বাঁদিকের রো-তে তার বাবা-মা আর ডানদিকে তার শ্বশুর-শাশুড়ি। কুড়ি মিনিটের মধ্যেই বাস এসে থামল পার্কাস রোডের বড় শপিং মলের ঠিক উল্টোদিকের নামকরা রেস্তোঁরা-'হোটেল ডেলিশিয়াস'-এর সামনে। বাস থেকে নামতেই রিক্তার চোখ গিয়ে পড়ল শপিং মলের সামনে বসবার জায়গার উপর। পুলকিত চোখে সুবীরকে অনেক কিছু বলতে চেয়ে পিছনে ফিরতেই তার কানের কাছে শুনতে পেল ,''চিনতে পারছ জায়গাটা? আজকের দিনে এখানেই আমাদের প্রথম দেখা। তাই এই হোটেলেই আজ লাঞ্চের ব্যবস্থা করেছি।''

সীমানার ও'ধারে

মিলি ঘোষ

আকাশ অভিদীপ্তর কাকা।

বলেছিলেন, ''আলো নামটা রাখতে পারিস। একটু ব্যাকডেটেড। কিন্তু আলো'র অর্থ বাচ্চাদের কাছে সহজবোধ্য। তা ছাড়া অন্ধকার থেকে আলোতে ফেরানোই আমাদের লক্ষ্য।''

সেই থেকে - আলো।

ছাত্রদের বেশিরভাগেরই ছাদ বলতে খোলা আকাশ। বাবা এদের অনেকেরই নেই বা হদিস নেই। স্বাভাবিকভাবেই এরা প্রত্যেকে এক একটি 'ব্ল্যাংক পেপার'। রাবার দিয়ে ঘষে ঘষে ভুল শুধরে দেবার প্রয়োজন পড়ে না। তবে ধরেবেঁধে আনতে হয়। দূর থেকে অভিকে দেখতে পেলেই এক দৌড়ে চোখের আড়ালে। ছেলেটির মা হয়তো তখন প্ল্যাটফর্মের একপাশে স্টোভ জ্বেলে ভাত বসিয়েছে।

অভিকে দেখে ঝাঁজিয়ে উঠল, ''পড়ে কী হবে? পড়লে পয়সা দেবে? তোমরা? ''

আকাশের অভিজ্ঞতা ও ভাবনার গভীরতা অভি আর আমোঘার থেকে অনেকটাই বেশি।

তিনি বলেন, ''দেখ, যতই বেঁচে থাকার প্রথম শর্ত খাদ্য হোক, খিদে একটা অভ্যেস। যতদিন তা চাপা পড়ে থাকে ততদিন দিব্য গুলি খেলে বা কুকুরকে ইট মেরে কাটিয়ে দেওয়া যায়। কিন্তু বন্ধ দরজায় যদি রোজ কড়া নাড়া হয়,তাহলে দরজার ওপাশে ঘুমিয়ে থাকা শিশু নিজেই খিল খুলে বেরিয়ে আসবে এবং সে'ই বুঝিয়ে দেবে খাদ্যই মানুষের প্রথম চাহিদা।''

তাই অপ্রত্যাশিত বৈকালিক আহারের আকর্ষণে ছাইয়ের গাদায় লুকিয়ে থাকা হিরে-মাণিকের দল রবিবারেও আলোর দরজায় এসে ভিড় জমাল। মুখের অশ্রাব্য ভাষা যে শিশু কিশোরদের দিন রাতের সঙ্গী, রাতারাতি তারা তকমাখচিত ভদ্রলোক হয়ে উঠবে, এমন আশা আলো'র নেই। ছুটির পরে আলোর সন্তানেরা কিছুটা নিজের রূপ ধারণ করে। রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে হুটোপুটি, সঙ্গে নিজেদের ঘরানার কিছু বুলি। আর এখানেই আপত্তি সুশীল সমাজের। বিজ্ঞজনেদের একজনও কিন্তু এদের বাবা বাছা করে বোঝাতে এগিয়ে আসেননি। বরং দলবেঁধে এসে গম্ভীর গলায় আপত্তি জানিয়ে গেছেন অভিদের কাছে। তর্ক বিতর্ক উচ্চ পর্যায়ে ওঠেনি। অভিদীপ্ত জানে, তথাকথিত শিক্ষিত মহলকে বোঝানো অত সহজ কাজ নয়।

ও বিনয়ের সঙ্গেই বলেছে ''রবিবার করে চলে আসুন না, দাদারা। ক্লাসের শেষে গল্প গুজব করা যাবে। একটা লাইব্রেরি করারও ইচ্ছা আছে। এখন সামান্য কিছু বই রাখতে পেরেছি। ভালো লাগলে আপনারাও নিয়ে পড়তে পারেন।'' অভির বলার মধ্যে এমন কিছু থাকে, যা মানুষকে মারমুখী হতে দেয় না। একমত হোক বা না হোক।

অভি আর অমোঘার একটাই দুঃখ, বাচ্চাদের বাল্য, কৈশোর কেটে যাচ্ছে মাঠের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত না দৌড়েই। যেদিন আকাশে গোল থালার মতো চাঁদ ওঠে, বাচ্চারা হৈ হৈ করে ছুটে বেরিয়ে আসে ক্লাস থেকে। কিন্তু রোজ তো আর চাঁদ ওঠে না। মাঝেমাঝে ঘন কালো অন্ধকারও থাকে। সে অন্ধকারের গাঢ়ত্ব বোঝেনা চার দেওয়ালের নিশ্চিত আশ্রয়ের সভ্য সমাজ। ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানোয় আপত্তি ছিল অভির বাবা মায়েরও। তবু কিছু মানুষ তো থাকেই, যাদের জন্য জীর্ণ ফাটা দেওয়ালে আজও ফুল ফোটে, পৃথিবী ঘোরে, বসন্ত আসে যায়।

ক'দিন আগে সন্ধেবেলায় পড়ুয়ারা ঠোঙায় করে মুড়ি মাখা খাচ্ছিল। অমোঘার হঠাৎ চোখে পরে, বাপি অর্ধেক খেয়ে বাকিটা ব্যাগে ঢুকিয়ে রাখছে।

অমোঘা জানতে চাইল, ''কী রে বাপি, খেলি না?''

বাপি চুপ।

অমোঘা কাছে যেতেই মুখ তুলে বলল, ''ভাইয়ের জন্য নিয়ে যাচ্ছি।''

অমোঘার গলার কাছটা দলা পাকিয়ে আসে।

জানতে চাইল, ''ভাই কত বড়ো?''

''পাঁচ বছর।''

''ওকেও নিয়ে আসবি পড়তে। পাঁচ বছর তো হয়েছে।''

''ভাই কথা বলতে পারে না। আগে পারতো।''

থমকে যায় অমোঘা। বাপির থেকে জানতে পারে, ভাইয়ের নাম বাবুল। মা লোকের বাড়ি কাজ করে।

নিজের প্রয়োজনেই আজ অমোঘা বাপির মায়ের সঙ্গে দেখা করল। ওদের সব সময়ের কাজের মাসি দিন দশেকের ছুটি নিয়ে বাড়ি যাবে, সুন্দরবনে। বাপির মা যদি এই দশদিন একটু সময় বার করতে পারে।

বলল, ''ঠিক আছে বৌদি। আমি সকাল সকাল চলে যাব। খালি মধ্যিখানে আমাকে একটু ছুটি দেবেন।''

''বাড়ি ফিরবে?''

''না বৌদি। অন্য বাড়ির কাজগুলো সেরে নিয়েই চলে আসব।''

কিন্তু সমস্যা বাপির ভাই বাবুলকে নিয়ে। স্বাভাবিক বলতে মানুষ যা বোঝে, ও তো ঠিক তেমন নয়। জীবন-সংগ্রামে নাজেহাল বাপির মা তাই ছোটো ছেলেকে কাছ ছাড়া করতে চায় না। কিন্তু অভির মা চিত্রা তো এই ছেলেকে দেখে অস্থির হয়ে যাবেন। বিরক্ত হয়ে কী না কী বলে বসবেন!

বাবুল সারাদিন থাকবে শুনেই অমোঘাকে সাবধান করেছেন চিত্রা, ''বাচ্চা নিয়ে আসে আসুক। কিন্তু এটা ওটাতে যেন হাত না দেয়। বারণ করে দিও।''

অফিস থেকে তাই দুরুদুরু বক্ষেই বাড়ি ফেরে রোজ অমোঘা। বাচ্চাটা কী কাণ্ড ঘটিয়েছে কে জানে! ঢুকেই তো অভিযোগের মুখে পড়তে হবে।

কিন্তু তিন চার দিন কেটে গেল, কোনও দিক থেকেই কোনও অভিযোগের তির এল না। অমোঘাও নিজে থেকে কিছু জানতে চায় না।

রবিবার। অমোঘা একটু দেরি করেই ঘুম থেকে উঠেছে আজ। বাপির মা ততক্ষণে এসে গেছে।

অমোঘাকে উঠতে দেখে টেবিলে চা দিয়ে বলল, ''বৌদি, তোমার চা।''

''ঢাকা দিয়ে রাখো। আমি মুখ ধুয়ে আসি।''

কাপ হাতে রান্না ঘরে উঁকি দিয়ে অমোঘার চোখের পাতা স্থির। বাবুলকে পাশে বসিয়ে দুধ বিস্কুট খাওয়াচ্ছেন চিত্রা। আর বাবুল একটা বাটি নিয়ে মেঝেতে ঠক ঠক আওয়াজ করে যাচ্ছে একভাবে।

অমোঘাকে চায়ের কাপ হাতে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে মুখ তুলে হাসলেন চিত্রা। একটা বোকা বোকা হাসি। অমোঘার সামনে তখন একটা গাঢ় নীল আকাশ। তাতে খেলা করে বেড়াচ্ছে টুকরো টুকরো সাদা মেঘ। এমন স্বচ্ছ আকাশ অমোঘা বহুকাল দেখেনি।

একটু ইতস্তত করে চিত্রা বললেন, ''তোমরা তো কত মানুষের জন্য কত কী করো, বাবুলের জন্য কিছু করতে পারবে না? ডাক্তার দেখালে যদি সেরে ওঠে।''

চিত্রার আবেগী কণ্ঠস্বর দিনের শুরুটাকে একেবারে নাড়িয়ে দিল। চোখের জলে অমোঘার কাপের চা তখন উথালপাথাল।

একটু ধাতস্থ হয়ে বলল, ''কেন পারব না, মা? খুব শিগগিরি আমরা ওর ট্রিটমেন্টের ব্যবস্থা করব। মনে হয় ওর অটিজম আছে।''

চিত্রা অবাক হয়ে বললেন, ''সেটা আবার কী!''

''আমিও ঠিকমতো জানি না, মা। ভুলও হতে পারি। আসলে ক'দিন আগে অটিজম বেবিদের নিয়ে লেখা একটা বই পড়লাম। তাই মনে হলো।''

''কিন্তু সেটা কী জিনিস?''

অমোঘা বলে গেল, ''এই ধরনের বাচ্চারা সমাজের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারে না। সমবয়সীদের থেকে এদের বুদ্ধি কম থাকে। কিন্তু বিচরণ করে এক বিশাল কল্পনার রাজ্যে। সেখানে ওরা স্ব-ইচ্ছায় ভেসে বেড়ায়।''

চিত্রা অমোঘার দিকে তাকিয়ে রইলেন।

অমোঘা একটু থেমে আবার বলল, ''জানেন মা, ওরা না আমাদের মতো জটিল নয়। আমাদের দাগিয়ে দেওয়া সমাজ ব্যবস্থায় আমরা একশো ভাগ ঠিক হতে চাই। তাই অস্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতায় জড়িয়ে পড়ি। ওরা সে অর্থে একদম বেঠিক। তাই একেবারে স্বচ্ছ। দুপুরের নির্জন দিঘির মতো।''

চিত্রা কি সে'সব শুনতে পেয়েছেন?

অমোঘা ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে, বাবুলের খাওয়া শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু ও বাটিটা ঠুকেই চলেছে। আর চিত্রা?

চিত্রা তার অপার স্নেহে বাবুলকে আগলে বসে আছেন।

বাবুল হয়তো মেঝেতে বাটির আওয়াজ তুলে সে ভালোবাসার প্রত্যুত্তর দিচ্ছে।

''কী গো বৌদি খেলে না? চা তো ঠান্ডা হয়ে গেল!''

বাপির মায়ের কথায় সম্বিৎ ফেরে অমোঘার। কাপের চায়ে তখন শাশুড়ি-মা'র মুখের ছায়া। সেই ছায়াতে চোখ রেখে অমোঘা ভাবছে, শুধু শিশু কেন, মানুষ মাত্রেই বিশেষ। কোনও তকমা দিয়ে মানুষকে বেঁধে দেওয়া যায় না। না হলে, যে মা কোনওদিন আলো'র সন্তানদের মুখ পর্যন্ত দেখলেন না, তিনি আজ বাবুলের সঙ্গী হয়ে উঠলেন কী করে!

ভোরের দিকে এক পশলা বৃষ্টি হয়েছে। বাবুল বাটি ফেলে গুটি গুটি পায় বৃষ্টিস্নাত টগর গাছটার পাশে গিয়ে মুখ তুলে তাকিয়ে। গাছের অজস্র জলকণার মাঝে কোন্ স্বপ্নের জাল ও বুনে চলেছে, সে ওই জানে। সামাজিক নিয়ম-নীতিকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বাবুল তার নিজের শর্তে স্বাধীন। বাঁধনহারা কল্পনার রাজ্যে সে নিজেই সম্রাট।

দুর্গোৎসব

সুরঞ্জীত্ গাইন

একসময়, বঙ্গের প্রাণবন্ত ভূমিতে, বাতাস শরতের ফুলের সুবাসে ভরে উঠত এবং রাস্তাঘাটে হাসির শব্দ প্রতিধ্বনিত হত। দুর্গোৎসবের সময় এসেছিল, যে উৎসবটি মহিষাসুরের উপর দেবী দুর্গার বিজয় উদযাপন করত। কিন্তু এই বছরটি ছিল ভিন্ন। সোনাপাড়া গ্রামটি তার প্রাণ হারিয়ে ফেলেছিল, কারণ তাদের প্রিয় দেবীর মূর্তিটি উৎসব শুরু হওয়ার কয়েকদিন আগে রহস্যজনকভাবে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল। ছোট্ট গ্রামে অনায়া নামে এক সাহসী মেয়ে বাস করত। তার উজ্জ্বল চোখ এবং দৃঢ় হৃদয় নিয়ে, সে প্রায়শই সবুজ মাঠ এবং শান্ত নদীর ওপারে অভিযানের স্বপ্ন দেখত। অনায়ার ঠাকুমা তাকে দেবীর গল্প বলতেন যিনি অপরিসীম শক্তির অধিকারী ছিলেন এবং তবুও সর্বদা তার ভক্তদের মধ্যে ঐক্য ও ভালোবাসাকে উৎসাহিত করতেন। দুর্গোৎসবের আনন্দ ফিরিয়ে আনতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, অনায়া তার বন্ধুদের, রিজু এবং তারাকে একত্রিত করেছিল। রিজু ছিল একটা খেলাধুলাপ্রিয় ছেলে, চোখে একটা দুষ্টু দীপ্তি, আর তারা ছিল বয়সের চেয়েও বুদ্ধিমান, সবসময় বন থেকে শেখা নানা রকম ভেষজ ও প্রতিকার বহন করত। একসাথে, তারা নিখোঁজ প্রতিমা খুঁজে বের করার জন্য অনুসন্ধান শুরু করার সিদ্ধান্ত নিল। তিন বন্ধু যখন গ্রামের বাইরে যাওয়ার পথে, তারা লতাগুল্মের নীচে লুকানো একটি ঝলমলে গুহার সাথে ধাক্কা খেল।অনায়া তার দিকে একটা টান অনুভব করল, বাতাসে একটা পরিচিত শক্তির গুঞ্জন। ''এটা নিশ্চয়ই জাদু!'' সে চিৎকার করে উঠল, এবং তিনজন ভেতরে ঢুকে গেল। গুহার ভেতরে, তারা ঝলমলে স্ফটিক, কথা বলা প্রাণী এবং ভাসমান দ্বীপপুঞ্জে ভরা একটি রহস্যময় রাজ্য আবিষ্কার করল। ওরিয়েল নামে একটি জ্ঞানী বৃদ্ধ পেঁচা তাদের উপরে একটি ডালে বসে ছিল। ''এই মোহনীয় জায়গায় তোমাদের কী নিয়ে এসেছে?'' পেঁচা সন্ধ্যার বাতাসের মতো মৃদু কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল।

''আমরা দেবী দুর্গার প্রতিমা খুঁজছি, যা আমাদের গ্রাম থেকে চুরি হয়ে গেছে,'' অনায়া উত্তর দিল, তার কণ্ঠ আশা এবং ভয়ের মিশ্রণ। ''আমরা বিশ্বাস করি এটি এখানেই থাকতে পারে।'' ওরিয়েলের সোনালী চোখ বোঝাপড়ায় জ্বলজ্বল করছিল। ''প্রতিমাটি কালিক নামে এক লোভী জাদুকরের হাতে। সে ছায়া দিয়ে তৈরি দুর্গে এটি পাহারা দেয়। এটি পুনরুদ্ধার করতে, তোমাকে এই রাজ্যের প্রাণীদের একত্রিত করতে হবে, কারণ কেবল একসাথেই তুমি তাকে চ্যালেঞ্জ করতে পারো।'' একটি নতুন লক্ষ্য নিয়ে, অনায়া, রিজু এবং তারা রহস্যময় ভূমির মধ্য দিয়ে ভ্রমণ করে, অসংখ্য প্রাণীকে একত্রিত করে। তারা ভীম নামে এক ভদ্র দৈত্য, আলোর শক্তি ধারণকারী নীলা নামে এক ক্ষুদ্র পরী এবং তার ধূর্ততার জন্য পরিচিত রোনান নামে একটি সাহসী শিয়ালকে বন্ধুত্ব করেছিল। প্রতিটি প্রাণী তাদের উদ্দেশ্যকে শক্তি যোগ করেছিল, অনন্য ক্ষমতা ভাগ করে নিয়েছিল যা তাদের কালিকের মুখোমুখি হতে সাহায্য করবে। অবশেষে যখন তারা কালিকের দুর্গের কাছে পৌঁছাল, ছায়াগুলি তাদের চারপাশে অশুভভাবে নাচতে লাগল। দরজাগুলি খুলে গেল, মধ্যরাতের মতো অন্ধকার পোশাক পরা জাদুকরকে প্রকাশ করল। কালিক হেসে উঠল, বজ্রপাতের মতো শব্দ। ''বোকা বাচ্চারা! তুমি কি মনে করো তুমি আমার কাছ থেকে মূর্তিটি কেড়ে নিতে পারবে?'' কিন্তু অনায়া, তার বন্ধু এবং মিত্রদের দ্বারা উৎসাহিত হয়ে এগিয়ে গেল। ''আমরা যুদ্ধ চাই না, কালিক।''আমরা এমন বন্ধু হিসেবে একত্রিত হয়েছি যারা ভালোবাসা এবং সম্প্রদায়ের শক্তিতে বিশ্বাসী। মূর্তি মানুষের, একাকী যাদুকরের নয়!'' তার কথা দুর্গ জুড়ে প্রতিধ্বনিত হয়েছিল, এবং সেই মুহূর্তে, মন্ত্রমুগ্ধ রাজ্যের প্রাণীরা গানে একত্রিত হয়েছিল, একটি সুর যা ঐক্যের মূল সারাংশের সাথে প্রতিধ্বনিত হয়েছিল।

তাদের সম্মিলিত আলোর নীচে ছায়া গলে গিয়েছিল, এবং যাদুকর তাদের বন্ধনের শক্তিতে অভিভূত হয়ে পড়েছিল। তাদের হৃদয়ের আন্তরিকতা বুঝতে পেরে, প্রতিমার উপর কালিকের আঁকড়ে থাকা দুর্বল হয়ে পড়েছিল। আলোর ঝলকানি দিয়ে, দেবী দুর্গা স্বয়ং তাদের সামনে আবির্ভূত হন, তার দীপ্তিময় রূপ অন্ধকার দুর্গকে আলোকিত করে। ''তোমাদের সাহস এবং ঐক্য লোভের শৃঙ্খল ভেঙে দিয়েছে,'' সে ঘোষণা করে। ''মনে রেখো, আমার বাচ্চারা, তোমাদের ঐক্যের মধ্যেই প্রকৃত শক্তি নিহিত।'' হাতের দোলায়, প্রতিমাটি অনায়ার কাছে ফিরে আসে, তাকে এটি তার হৃদয়ের কাছে ধরে রাখতে দেয়। যাদুকরের চোখ নরম হয়ে যায়, এবং সে আলোয় অদৃশ্য হয়ে যায়, তার চারপাশের প্রেমে রূপান্তরিত হয়।

-

অনায়া, রিজু, তারা এবং তাদের বন্ধুরা সুরক্ষিতভাবে মূর্তিটি হাতে নিয়ে সোনাপাড়ায় ফিরে আসেন। তাদের ফিরে আসার পর গ্রাম আনন্দে ফেটে পড়ে এবং দুর্গোৎসবের প্রস্তুতি তৎক্ষণাৎ শুরু হয়। সেই বছর, উৎসবটি আগের চেয়ে আরও প্রাণবন্ত ছিল, রঙিন সাজসজ্জা, আনন্দময় নৃত্য এবং কৃতজ্ঞতায় ভরা প্রার্থনার মধ্য দিয়ে। উৎসবের দিন, যখন তারা প্রতিমাটির পূজা করত, অনায়া বুঝতে পারত যে দুর্গোৎসবের আসল মর্ম কেবল ঐতিহ্য বা মহিমার মধ্যেই নয়, বরং দেবীর অনুপ্রেরণায় সম্মিলিতভাবে নিহিত। সেই দিন থেকে, গ্রামটি কেবল মন্দের উপর শুভর জয়ই উদযাপন করে না, বরং বন্ধুবান্ধব, পরিবার এবং সম্প্রদায়ের মধ্যে শক্তিশালী বন্ধনও উদযাপন করে। এবং এইভাবে, অনায়া এবং নিখোঁজ প্রতিমার কিংবদন্তি প্রতি বছর দুর্গোৎসবের সময় বলা একটি লালিত গল্পে পরিণত হয়, যা সকলকে মনে করিয়ে দেয় যে ঐক্যের মধ্যে শক্তি, আশা এবং জাদুর অফুরন্ত সরবরাহ থাকে।

তমসো মা জ্যোতির্গময়

মলয় পাল

তমসা রূপে গুণে অনন্যা । কিন্তু নামের সাথে কি অদ্ভুত মিল,চোখে দেখতে পায় না সে।কুসুমপুর নামে একটা গ্রামে খুব গরীব পরিবারে জন্ম হওয়ায়,পরের বাড়ি কাজ করে সংসার চালায় তার বিধবা মা।তমসা আর তার বিধবা মায়ের কষ্টের সংসার।পাঁক এ পদ্ম ফুল ফোটার মতোই গরীব ঘরে সুন্দরী মিষ্টি তমসা গ্রামের অনেক মানুষেরই প্রিয়জন । অন্ধত্ব আর গরীব হয়ে জন্ম তার লেখাপড়া করার ইচ্ছাকে পূরণ করতে না দিলেও, বই পড়ার নেশা তাকে গ্রাস করেছিল।ছোট থেকেই তার একটি নেশা ছিল বই জমানো। তমসা পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে ঘুরে বাড়িতে পড়ে থাকা পুরনো বই বিক্রি করার নাম করে সংগ্রহ করে গ্রামের শেষে পোড়ো ভুতুড়ে বাড়িটার একটা ঘরে জমা করে রাখে । পাড়ার সবাই প্রায় তমসার কষ্টের কথা জানত

সেই কারণেই গ্রামের গরীব অন্ধ তামসাকে পাড়াতে কেউ কোন দ্বিধা না করেই বাড়িতে পড়ে থাকা পুরাতন বই দিয়ে দিত। সেই বই নিয়ে এসে জমা করার সাক্ষী ছিল শুধু তার ছোট বেলাকার খুব বড়লোক ঘরের একমাত্র ছেলে বন্ধু বিহু।বিহু তাকে সেই বইগুলি থেকে নানান লেখা পড়ে শোনাতো।বিহু মনে মনে ভালোবাসতো তমসাকে । হঠাৎ-ই হল ছন্দ পতন, বিহু-র বাবার গাড়িতেই এক দুর্ঘটনায় প্রাণ যায় তমসা-র । ভালোবাসাও যেন তমসা-র মতোই বিহু-র কাছ থেকে হারিয়ে যায়। বিহু জানতো তাদের ভালোবাসা পূর্ণতা যদি কখনো পায়, তা অনেক ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে হবে, তাই সে এই ভালোবাসার কথা অন্য কাউকে বলেনি কখনও। এদিকে তমসা-র এক এক করে সংগৃহীত পুরনো বই বিন্দু বিন্দু করে সিন্ধুর ন্যায় কখন যে পাহাড় প্রমান হয়ে উঠেছিল সে খবর কেউ রাখেনি। বিহু তামসার বই জমানোর নেশা সবাইকে জানায়, বলে তাদের ভালোবাসার কথা।সব শুনে গ্রামের মানুষজন সেই বই দিয়ে গ্রামে একটা ''তমসা-র খেলাঘর'' নামে গ্রন্থাগার তৈরি করেন। বিহু,তার ভালবাসার প্রতিদানে তমসা-র সেই সংগৃহীত কিছু পুরাতন বইয়ের মেলা করে গ্রামে, বইমেলার নাম দেয় ''তমসো মা জ্যোতির্গময়'' ।।

খবর
সোজাসুজি
খবর সোজাসুজি
চোখে চোখ রেখে কথা বলে !!!

প্রবন্ধ

কালের কবিয়াল

রবীন বসু

উনুনের দাউ দাউ আগুনে কিছু একটা জ্বলছে। পাশে দাঁড়িয়ে শীর্ণকায় তরুণ এক নাট্যকার। চোয়াল শক্ত। চোখে বেদনার অশ্রু। আগে অবশ্য কিছু কবিতা লিখেছেন। তা ছাপাও হয়েছে বিভিন্ন পত্রিকায়। কিন্তু মন ভরেনি। স্বপ্ন নাট্যকার হবার। মনে আশা তাঁর নাটক মঞ্চে মঞ্চস্থ হোক। নিজের লেখা নাটকের খাতা নিয়ে একদিন নামকরা এক নাট্যকারের সঙ্গে কলকাতা গেলেন। তিনি আবার তাঁর আত্মীয় হন। উদ্দেশ্য কলকাতার জনপ্রিয় নাট্যগ্রুপের ম্যানেজারের হাতে পাণ্ডুলিপি জমা দেওয়া। সে ভদ্রলোক পড়া তো দূর কথা, ছুঁয়েও দেখলেন না। উলটে চরম অসম্মান ও অপমান করলেন সেই নাট্যকারকে। তাঁর জন্য উমেদারি করার জন্য। ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে তরুণ নাট্যকার সব শুনে নিজেও ভীষণ ব্যথিত ও অপমানিত বোধ করলেন। কলকাতা থেকে গ্রামে ফিরে এই চরম সিদ্ধান্ত। পাণ্ডুলিপি পুড়িয়ে ছাই করে দিলেন।

সেদিনের সেই তরুণ নাট্যকার কিন্তু পরবর্তীতে ১২টি নাটক লিখেছেন। তাঁর রচিত কাহিনীর নাট্যরূপ দিয়ে অজস্র মঞ্চসফল নাটক অভিনীত হয়েছে। হয়েছে যুগান্তরকারী চলচ্চিত্র। বিশ্ববরেণ্য পরিচালকরা তাঁর কাহিনী নিয়ে ছবি করেছেন। তবু তিনি কবি নন, নাট্যকার নন, বিশ শতকের বাংলা সাহিত্যের এক শক্তিশালী ঔপন্যাসিক ও ছোটগল্পকার হিসেবে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। তিনি আর কেউ নন, গণদেবতা, কবি, হাঁসুলী বাঁকের উপকথা উপন্যাসের লেখক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। যিনি লিখেছেন, 'কালো যদি মন্দ তবে, কেশ পাকিলে কান্দো কেনে।'

১৮৯৮, ২৩ জুলাই পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম জেলার লাভপুর গ্রামে এক ভগ্ন জমিদার বংশে সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম। পিতা হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, মাতা প্রভাবতী দেবী। গ্রামের পরিবেশেই তিনি বড় হয়ে ওঠেন। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর নিজ গ্রামেরই মেয়ে উমাশশী দেবীর সঙ্গে লেখকের বিয়ে হয়ে যায়। এরপর উচ্চ শিক্ষার জন্য তিনি কলকাতায় আসেন। প্রথমে ভর্তি হন সেন্টজেভিয়ার্স কলেজে। পরে আশুতোষ কলেজ, তখন নাম ছিল সাউথ সুবার্বন কলেজ। কিন্তু কলেজে পড়ার সময় তিনি অসহযোগ আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন। এবং কারবাস করেন। এক বছর পর জেল থেকে বেরিয়ে কিছুদিন কলকাতায় কয়লার ব্যবসা করেন, পরে চাকরি নিয়ে কানপুর চলে যান। সুবিধে করতে না পেরে পুনরায় কলকাতা ফিরে আসেন এবং সমাজসেবা মূলক কাজ ও সাহিত্য চর্চাকে জীবনের ব্রত হিসেবে বেছে নেন।

কলকাতায় এসে তিনি কিছুদিন বৌবাজারে এক মেসে থাকতেন। এখানে বসে তিনি অনেক বিখ্যাত গল্প রচনা করেন। তাঁর প্রথম রচিত গল্প রসকলি। তখনকার সাড়া জাগানো 'কল্লোল' পত্রিকায় প্রকাশ পায় ১৯৩৭। এ গল্প পড়ে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ লেখককে প্রশংসা করেন। এরপর লেখেন অগ্রদানী, ডাইনি, ডাক হরকরার মতো সব কালজয়ী গল্প। প্রথমে বিভিন্ন জায়গায় ভাড়া বাড়িতে থাকতেন। পরিশেষে টালাপার্কে নিজে বাড়ি করেন। সেখান থেকেও এক সময় আবার বরানগরে চলে যান।

তিনি কালের কবিয়াল। মানবজীবনের অকৃত্রিম জয়গানই তাঁর সাহিত্য। সমাজের অন্ত্যজ প্রান্তিক মানুষজনের কথা তিনি যেভাবে বলেছেন, তাঁর আগে বাংলা সাহিত্যে তেমন ভাবে কেউ বলেননি। তারাশঙ্কর ছিলেন রাঢ়বঙ্গের মানুষ। লালমাটির দেশ, বাউল কবিয়াল বৈষ্ণব সুফি শাক্ত আর সতীপীঠের দেশ। উত্তর রাঢ়ের জনপদ, তার গ্রাম জীবন, লৌকিক দেবদেবী, চণ্ডীমণ্ডপ, মঠ, ভাঙা দেবদেউল, তান্ত্রিকের আসন, ধর্মঠাকুর; এইসব নিয়ে তাঁর আখ্যানের কাঠামো গঠিত হয়েছে। সেখানকার মানুষের বিশ্বাস, লোকাচার,পালপার্বণ জীবন্ত শরীর পেয়েছে তাঁর কাহিনীতে । রুক্ষ রূঢ় মাটি ও প্রকৃতির গল্প তিনি বলেননি, বলেছেন সেখানকার মানুষের গল্প। বোষ্টম, সাঁওতাল, বেদে বাগদি, কাহার, দুলে;এইসব অন্ত্যজ মানুষের অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই। তাদের সরলতা, লোভ, আশাভঙ্গ হিংসা-প্রতিহিংসা ও স্বপ্নের গল্প। গ্রাম ছাড়িয়ে জনপদ ছাড়িয়ে, জেলা প্রদেশ ছাড়িযে এক অখণ্ড ভৌগোলিক বিস্তার পেয়েছে তাঁর সাহিত্য। তিনি আন্তর্জাতিক সীমানায় পৌঁছে গেছেন। বহু ভাষায় অনুবাদ হয়েছে তাঁর রচনা।

দু'দু'বার সাহিত্যে নোবেল পুরস্কারের জন্য মনোনীত হন। জীবদ্দশায় ও মৃত্যুর পর।

এই যে আবহমান দেশ, তার মৃত্তিকা প্রকৃতি মানব সম্পদ ও ভৌগোলিক অখণ্ডতা নিয়ে বিরাজমান, তার

কি শুধু সম্পন্ন জমিদার-জোতদার মহাজন স্বত্বভোগীদের? কখনওই না। ভূমিহীন দরিদ্র জনমজুর কৃষকেরও। কারখানার কালিঝুলি মাখা শ্রমিকেরও। এই বোধ তিনি আমাদের মধ্যে জাগিয়েছেন। শিল্প বিপ্লবের ফলে আধুনিক গ্রাম জীবন ভেঙে নতুন নগর জীবন গড়ে উঠছে, এই উদ্যোগ পর্বের স্পষ্ট চিত্র যেমন তাঁর উপন্যাসে আছে, তেমনই ক্ষয়িষ্ণু জমিদারি প্রথা অবলুপ্তির বিলাপ, নতুন পুঁজির আগমন ; মানুষকে এক অনিকেত ভবিষ্যতের দিকে নিয়ে যাচ্ছে, তার ইঙ্গিত তিনি রেখেছেন 'জলসাঘর' 'অভিযান' প্রভৃতি গল্পে। দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যেকার সময়সীমায় রচিত হয় লেখকের প্রথম পর্বের উপন্যাসগুলো। একটা রাজনৈতিক বিশ্বাস তাঁর ছিল, কিন্তু সেই রাজনীতি তাঁর লেখক সত্তাকে আচ্ছন্ন করতে পারেনি। তিনি সত্যনিষ্ঠ দ্রষ্টার মতো যা দেখেছেন, উপলব্ধি করেছেন, তা স্পষ্ট ঋজু এক ভাষায় লিপিবদ্ধ করেছেন। মানব জীবনের ইতিহাস লিখেছেন তারাশঙ্কর। আধুনিক সভ্যতার সর্বগ্রাসী বিস্তার, ধনতান্ত্র ও পুঁজির আগ্রাসনে বাংলার গ্রামজীবনের যে ভাঙন, তা তাঁর পুরস্কারপ্রাপ্ত ও জনপ্রিয় উপন্যাসগুলোকে বিশিষ্টতা দিয়েছে। ধাত্রীদেবতা, কালিন্দী, গণদেবতা, পঞ্চগ্রাম প্রভৃতি এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য।

তারাশঙ্করের দ্বিতীয় পর্বের উপন্যাসগুলো নগর কেন্দ্রিক। সেখানে মানুষের বহিরঙ্গের নয়, অন্তরঙ্গ জীবনের গল্প বলেছেন। চরিত্রের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, জয় পরাজয়, সম্পর্কের জটিলতা, মনোবিকলন; এ সবই অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সঙ্গে বর্ণিত হয়েছে। সপ্তপদী, বিপাশা, অভিনেত্রী, ফরিয়াদ, মঞ্জরী অপেরা, শুকসারি কথা, যোগভ্রষ্ট, আরোগ্য নিকেতন প্রভৃতি লেখকের নাগরিক উপন্যাসগুলো চলচ্চিত্রায়ণের জন্য সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করে ঠিকই কিন্তু তাঁর নাগিনী কন্যার কাহিনী, হাঁসুলী বাঁকের উপকথা, গণদেবতা, পঞ্চগ্রাম, ধাত্রীদেবতা, কালিন্দী প্রভৃতি আঞ্চলিক-ধ্রুপদী উপন্যাসগুলো তারাশঙ্করকে বাংলা সাহিত্যে স্থায়ী আসন দিয়েছে।

বাংলা সাহিত্যকে তারাশঙ্কর প্রান্তিক মানুষের কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন কিংবা বলা যায় প্রান্তিক মানুষজন যাঁর লেখায় উঠে এসেছিল, আশ্চর্য দৃঢ়তায়, তাদের ক্ষোভ বঞ্চনা লড়াই আর বিদ্রোহ নিয়ে। তাই কালের নিয়মে অবলুপ্তির পথে যে প্রান্তিক জনজাতি, তাদের জীবনেতিহাস, সংস্কৃতি, তাদের গাথা-গল্প, সংস্কার জনশ্রুতি;সবই তিনি গভীর ভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন তাঁর সাহিত্যে সেই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণ এক মেদহীন সরল অথচ ঋজু গদ্যভাষায় বর্ণিত হয়েছে আপাত নিরস ও রুক্ষ হলেও সে ভাষার অর্ন্তনিহিত মাধুর্য তার আন্তরিক সাবলীলতা আমাদেরকে মুগ্ধ করে।

কথাসাহিত্যক তারাশঙ্করের উপন্যাসের সংখ্যা প্রায় ৬৫। গল্পগ্রন্থ আছে ৬৩। ১২টি নাটক, ৪টি প্রবন্ধের সংকলন, ৪টি স্মৃতিকথা, ২টি ভ্রমণ কাহিনী, একটি প্রহসন ও একটি কবিতা সংকলন 'ত্রিপত্র'। তাঁর রচিত কাহিনী অবলম্বনে চলচ্চিত্র নির্মাণ প্রভূত সাফল্যের মুখ দেখায়, তিনি মুম্বাই থেকে ডাক পেয়েছিলেন চলচ্চিত্রের কাহিনীকার হিসেবে যোগ দেওয়ার। উচ্চ বেতনের প্রলোভন ছিল। কিন্তু যাননি। সাহিত্য রচনায় তিনি সাফল্যের শীর্ষে উঠেছিলেন। পেয়েছেন বিভিন্ন পুরস্কার। রবীন্দ্র পুরস্কার, সাহিত্য আকাদেমি, জ্ঞানপীঠ, শরৎ স্মৃতি পুরস্কার, জগত্তারিণী স্মৃতি পদক। পেয়েছেন পদ্মশ্রী ও পদ্মভূষণ উপাধি। ১৯৫৭ সালে চিন সরকারের আমন্ত্রণে সেদেশে সফরে যান। ১৯৫৮ তে অ্যাফ্রো-এশিয়ান লেখক সঙ্ঘেরের প্রস্তুতি সভায় যোগ দিতে সোভিয়েত ইউনিয়ন যান। এরপর তাসখন্দে অনুষ্ঠিত অ্যাফ্রো -এশিয়ান লেখক সম্মেলনে ভারতীয় প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন। তবুও 'গেঁয়ো' 'স্থূল লেখক' এ অপবাদ সহ্য করতে হয়েছে তাঁকে।

তারাশঙ্কর ছিলেন জীবন রসিক। অভাব দুঃখ ও স্বপ্ন ভঙ্গের সঙ্গে লড়াই করেছেন আজীবন। আর এই শক্তি তিনি পেয়েছিলেন মা প্রভাবতী দেবী ও স্ত্রী উমাশশী দেবী, তাঁর 'বড়বৌ'- এর কাছ থেকে।

জীবনকে পুরোপুরি ভালবেসে ছিলেন। তার সৃষ্ট চরিত্রগুলো তাই দোষেগুণে রক্তমাংসের মানুষ হয়ে উঠেছে।

তিনি যেমন মানুষকে ভালবেসেছিলেন, নিজ পরিবার আত্মজনকে ভালবেসেছিলেন, সর্বোপরি নিজের দেশকেও ভালবেসেছিলেন। তাঁর সাহিত্য তাই এক অর্থে দেশ বন্দনা। ধাত্রীদেবতা,কালিন্দী, গণদেবতা, পঞ্চগ্রাম উপন্যাসের আখ্যান চরিত্র সেই কথাই বলে। তবু তিনি বার বার বিরূপ সমালোচনায় বিদ্ধ হয়েছেন। রক্তাক্ত হয়েছেন। এমনকি 'সন্দীপন পাঠশালা' উপন্যাস চলচ্চিত্রায়িত হতে এক বিশেষ সম্প্রদায়ের মানুষকে হেয় করা হয়েছে, এই অভিযোগ তুলে তাঁকে হাওড়ায় শারীরিক ভাবে নিগৃহীত করা হয়। যখন অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আদালতে বিচার চলছিল, অপরাধীদের চিনতে পেরেও

তিনি অস্বীকার করেছিলেন। পরে এ প্রসঙ্গে বলেন, ওদের ক্ষমা করে দিলুম। আসলে ওরা তো আমার এই দেশের মানুষ। তাছাড়া ওরা স্বেচ্ছায় এ কাজ করেনি, পিছন থেকে ওদের উত্তেজিত করেছিল ও নির্দেশ দিয়েছিল কোনও রাজনৈতিক বড় মাথা। এই হলেন তারাশঙ্কর। তিনি পুরস্কারে যতটা উচ্ছ্বসিত আনন্দিত, আবার অপমান ও তাচ্ছিল্যে ঠিক ততটাই আহত হন। তবু প্রকৃত জীবন রসিকের মতো মেনে নিয়েছিলেন এই অমৃত ও গরলকে।

বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের যে তিনটি উপন্যাস জনপ্রিয়তায় মিথ হয়ে আছে, তা হল 'শেষের কবিতা', দেবদাস' ও 'কবি'। রাঢ়বঙ্গের কবিগান ও ঝুমুর নাচের প্রতি তাঁর খুব টান ছিল। তিনি রাত্রি জেগে এইসব পালাগান ও আসরের নাচ দেখতেন। সেই অভিজ্ঞতায় তিনি রচনা করলেন 'কবি' উপন্যাস। লুপ্তপ্রায় ঝুমুর ও কবিগানকে অমর করে দিলেন কাহিনীতে। নিতাই কবিয়াল, বসন, ঠাকুরঝি, রাজন আর তাদের জীবনকে নিয়ে এক মায়ার জগৎ তৈরি করলেন। আমার মনে হয় তারাশঙ্কর নিজেই এই কালের কবিয়াল। মানুষ আর দেশ-এর প্রতি আবুক ভালবাসায় তিনি যেন সারাজীবন ধরে জীবনের কবিগান গেয়ে গেছেন। তবু সাধ মেটেনি। কবি উপন্যাসের শেষে কবিয়াল নিতাইয়ের মুখ দিয়ে তাই তিনি বলিয়েছেন, ''ভালবসে মিটল না সাধ, হায় জীবন এত ছোট কেনে !''

সোমসপুর ২ গ্রাম পঞ্চায়েত

(ধনিয়াখালি পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত)

উন্নয়নের সাথে,উন্নয়নের পাশে

WBeDistrict.Com
আমাদের পাড়া
আমাদের সমাধান
AMADER PARA, AMADER SAMADHAN
Standard Operating Procedure

মাটির কাছে চাষীর পাশে
কৃষকবন্ধু

লক্ষ্মীর ভাণ্ডার

কার্তিক চন্দ্র দে
উপ প্রধান

পুষ্প ভান্ডারী
প্রধান

নীরব যে মানুষ

তন্ময় কবিরাজ

লেখক হুমায়ুন আহমেদ লিখেছিলেন,''আমার হারিয়ে ফেলার কেউ নেই,কাজেই খুঁজে পাওয়ারও কেউ নেই, আমি মাঝে মাঝে নিজেকে হারিয়ে ফেলি।'' জয় গোস্বামীর নীরবতাকে আবিস্কার করতে গিয়ে হুমায়ুন আহমেদের কথাগুলো সবার আগে মনে এলো। কবি জয় গোস্বামীর কাছে নীরবতা শান্তির প্রতীক। নীরবতায় কবি জেগে থাকেন। কখনও বা প্রশ্ন করেন,''জগতে কি কারোও ভালো হবে এই লেখায়? ব্যবস্থা বদলাবে।'' নীরবতায় কবি জয় গোস্বামী প্রতিবাদী,''আমি কোথায়?/কী করে এসব দেখছি?'' কারন তিনি ব্রত নিয়েছেন শান্তি ভিক্ষার যদিও কবি মনে করেন,''শান্তি ক্লান্ত''আজ। তাই কবি দেখতে পান ''শান্তির খোলা চুল/উড়িয়ে নিচ্ছে বাতাসের কত বোন/বাতাসের কতো ভাই।'' নীরবতার ভিতর শান্তি পেয়েছে মেটাফর, পারসনিফিকেশন। শব্দের পর শব্দ বুনে কবি নীরবতার সাধনা করেছেন। সমাজ পরিস্থিতি কবিকে করেছে নীরব। জয়ের নীরবতায় ঘুমিয়ে আছে তাঁর ঝাউপাতারা, তাঁর কবিতার সাঁঝবাতিতে লেখা হয় রূপকথার গল্প, কখনও কবিতার শেষ শব্দের অভাবে যারা বৃষ্টিতে ভিজে ছিল তাদের কবি বলে দিতে পারেন,''ভেসে তো যেতই, মনে না করিয়ে দিলে/... কবি ডুবে মরে, কবি ভেসে যায় অলকানন্দার জলে।''অভিমানে নীরবতা বড়ো গভীর। কবি সে নীরবতায় প্রেম উপভোগ করেন, অভিমানকে প্রশয় দেয় সযত্নে,''যে বইতে রেখে ছিলাম, সেখানে আজ/কত সব পাখি উড়ছে, বসছে, সাঁতার কাটছে।'' কবি স্বপ্ন দেখেন নীরবতায়, নীরবতায় হেঁটে যান সিংহল মালয় কারন ''পাগলী, তোমার সঙ্গে ভয়াবহ জীবন কাটাব''। তবু বৃথা আশা। কবি লিখেছিলেন,''স্বপ্নে তোকে বাড়ীর দিকে এগিয়ে দিতে যাই/স্বপ্নে এসে দাঁড়াই পাড়ায় মোড়ে।'' তবু ভালোবাসতে চাইলে যখন ভালবাসা যায়না কবি উপলদ্ধি করেন মনের ধূসরতা। কবিতার বেরঙিন ডাইরিতে সে সত্য তুলে ধরতে তিনি দ্বিধা বোধ করেন না। কবি সহজেই বলে দেন,''প্রতিদিন কিন্তু ইচ্ছাকে পুড়িয়ে মারি/প্রতিদিন কিছু ইচ্ছাকে পাঠাই নির্বাসনে/ভালোবাসা কি প্রতারক হৃদয়/ভেঙেছে যার সেই জানে।'' কবি জয় গোস্বামীর নীরবতায় উঠে এসেছে প্রেম বিরহের কোলাজ। শুধু নীরবতায় তিনি পান করেছেন প্রেমের নির্যাস। কখন ফিরে পাবার বাসনা প্রকাশ করেছেন,''তুমি কি একদিন আসতে পারো/পাখির ডাক হয়ে? শেষ রাতে/আমি তো জানালায় বসেই থাকি।'' কিছু প্রশ্নের উত্তর আজও বাকি। কবি জয় গোস্বামী তাই বলেন,''শুধু আমাকে দেখার জন্য/এতো দিন ধরে এতবার/গাছের দিকে তাকিয়েছ/জলের দিকে তাকিয়েছ/... তাও একবার নিজে থেকে বলতে পারলে না?'' প্রেমের বিকল্প কবির অজানা। কবি শুধু জানেন প্রেমের পরে বিরহ। পদাবলীর চিরন্তন আক্ষেপ ধরা পড়ে কবিতায়। কবি জয় গোস্বামী রূপকের আশ্রয়ে তুলে ধরেন বিবর্ণ চারপাশ, এ যেনো ব্রেখেটের ক্যাকোফোনি ,''হেলানো গাছ, গলতে থাকা/ইঁট কাঠের বাড়ি/স্বপ্নে মরা ময়ূর তার...।'' ময়ূর কি মেটাফোর নাকি ব্রেখেটের গদট। উত্তর দিতে পারেন শুধু কবি জয় গোস্বামী। আবেগ ধাক্কা দেয় হতাশায়, শেক্সপিয়ারের টু বি অ্যান্ড নট টু বি মধ্যেই বয়ে চলে যায় জীবনের কিছু ফাধনী সময়। কবি তাই লেখেন,''একটা বিচ্ছেদ থেকে/পরের বিচ্ছেদ/যেতে যেতে/কয়েকটা দিন মাত্র/মাঝখানে পাতা আছে/মিলনের সাঁকো/মেঘ করে আসবেই/... আঙুলে আঙুলে আঁকড়ে রাখো।'' সম্পর্ক বড্ড জটিল, যেখানে ফ্রয়েডের মনের গোপন সমীকরনও মেলেনা। মৌঘাম তাঁর দা কাইট গল্পে সে কথা স্বীকারও করেছেন।

নীরবতার ভিতর কবি শান্তি খুঁজে পান। গভীর নীরবতার শব্দে কবি স্বীকার করেছেন জীবনের সব অব্যাক্তকে । তাই কবি জয় গোস্বামী লিখেছেন, ''পৃথিবীতে একমাত্র/এই ঘরটির কাছে/কোনোই দোষ করেনি।'' কবি নীরবতাকে নারীর মত ভালোবাসেন কারন সে শুন্যতা বড়ো পবিত্র আবার শিশুর মতো তিনি নীরবতাকে প্রশয় দেন। লেখক চার্লস লাম্বের ড্রিম চিলড্রেনের মত তারা সর্বদা প্রতিক্রিয়া জানায়। কবি জয় গোস্বামী তাঁর কবিতায় নীরবতার মধ্যে মহাশূন্যতার সন্ধান করেন। সেই শুন্যতা নির্বাণ, মোক্ষ লাভের পথ। কবিতার শব্দের ভিতর দিয়ে তিনি নিজেকে উজার করে করেছেন, সূক্ষ্ম হতে চেয়েছেন যাতে কবিতার অন্তিমে দেখা হয়ে যায় অপার্থিবের সঙ্গে। তাঁর ব্যর্থতায় সৃষ্টি হয়েছে হাজার কবিতা। কিটসের মত কবিতার ডানাতে ভর করে তিনি পলাতক, শব্দ নাইটিঙ্গেল পাখির মত হাতছানি দেয়। তখন নীরবতা আরোও গম্ভীর। শুধু শব্দের স্পন্দন অনুভব করা যায়। পার্থিব শরীরে অপার্থিব শিহরণ জাগাতে পারেন

কবি সাধক জয় গোস্বামী। কবি লেখেন,''এতোই অসার আমি, চুম্বন বুঝিনি/মনে মনে দিয়েছিলে, তাও সে নাস্তবোঝার নয়/... একাই খুঁজেছো তুমি?/আমি বুঝি তোমাকে খুঁজিনি?''

কবি জয় গোস্বামীর নীরবতা ইয়েটসের বাইজেন্টাইন। সময় অসময়ে তিনি সেখানে চলে যান। নীরবতা তাঁর প্রতিবাদ। নীরবতার আগুনে পুড়ে যায় শব্দ,তিনি গর্জে উঠেন। কবি অস্থির, ইউলিসিসের মত তিনি তরুন, সমাজের বিপরীতে গিয়ে শুধু জীবনের স্বার্থে তিনি প্রগতিশীল। তিনি জীবনকে উপভোগ করতে চান।সুনীল শক্তির মত তিনি বাহ্যিক উপকরণে খুশী নন, তাই বিচরণ করেছেন মনের অন্তরালে, মান অভিমানের ঝাড়বাতিতে এক পৃথিবীর ঠিকানা দিয়েছেন। তিনি বিশ্বাস করেন স্ট্রিম অফ কোনসাসনেসে। মনের চোরবালিতে ডুবে যান, তুলে আনেন অতল মনের গুপ্তধন যার আলোতে রয়েছে নতুন জীবনের সন্ধান। তিনি তো আমাদের মনের প্রতিনিধি, আমাদের জীবনের প্রতিবেশী। যার রঙ শুধু ভালোবাসা। তিনিই তো বলতে পারেন,''আজ যদি আমাকে জিজ্ঞেস করো, এই জীবন নিয়ে কি করেছ এতো দিন?''

কবি জয় গোস্বামীর যাত্রা শুরু হয়েছিল ১৯৭৩সালে সেলিং ফ্যান কবিতা দিয়ে যার প্রকাশ ঘটেছিল সীমান্ত সাহিত্য, পদক্ষেপ, হোমশিখা পত্রিকায়। রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দের ভক্ত তিনি। তবু নীরবতার রঙ তুলিতে তিনি সমান দক্ষ। তিনি নীরবতার ভাষা পড়তে পারেন, বুঝতে পারেন তাই নীরবে একাকীত্বের ভিতরে প্রেমের পসরা সাজান। ভাঙা প্রেমও এতো মধুর তাঁর বর্ণনার ভাষাতে। মনে হয়, বিচ্ছেদ না হলে বোধ হয় প্রেমের অনুপম সৌরভ ছড়িয়ে পড়ত না। তিনি জানেন, প্রেমিক পাল্টে যায়, প্রেম পাল্টায় না। ভালোবাসা নিরাকার, মানুষের মধ্যেই তার আকার জন্ম নেয়, তাকে শাসন করে ইচ্ছা, স্বপ্ন। পছন্দ না হলে মানুষ বদল হয়, প্রেমে আসে বিরহ। প্রেম আবার আকার খুঁজে পাবার বাসনায় হাঁটতে থাকে। এটাই জীবন। নীরবতার সভ্যতায় কবি বাস করেন মান অভিমানের প্রতিবেশী হয়ে। কবিতাই তাঁর বসত বাড়ি। তাই কবিতাই তিনি বলে উঠেন ,''যে লেখা পড়ে তোমাদের শুকনো চোখে জল আসবে/সেই লেখা আমার হাত থেকে বেড়িয়ে/উড়ে ওই ডালে গিয়ে বসল/... গাছ, মনে মনে কবিতা বলছে।'' তাঁর উপলদ্ধিতেই রয়েছে কবিতা ।আর্থার রিম্বাউদের মৃত সৈনিকের সহজ সরল হাসির প্রতি তিনি সহানুভূতিশীল,''সে ভুলে গিয়েছে তার গত শিরচ্ছেদ/অথচ গলায় তার/এখনো মালার মত দাগ।'' তাঁর নীরবতার দর্শনের সমর্থন পেয়েছেন পিথাগোরাস, স্পিনোজার। তাই ব্রাটেন্ড রাসেল বলেছেন, নীরবতায় জীবনের সুখ উপভোগ করা যায়।

খাজুরদহ মেলকী গ্রাম পঞ্চায়েত
(ধনিয়াখালি পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত)

আমাদের লক্ষ্য ঃ-

১। মিশন নির্মল বাংলা কর্মসূচীর মাধ্যমে স্বচ্ছ পঞ্চায়েত গড়ে তোলা।

২। গাছ লাগিয়ে পরিবেশদূষণ রোধ করা।

৩। এলাকার মানুষের আর্থ সামাজিক উন্নয়নের জন্য কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পগুলিকে
গ্রামবাসীদের কাছে পৌঁছে দেওয়া।

৪ পাড়ায় পাড়ায় প্রকল্পে আমাদের সাফল্য

৫। দুয়ারে সরকার কর্মসূচীকে সফল করে তোলা।

বিশ্বজিৎ কুমার
উপ প্রধান

চায়না মালিক
প্রধান

২৫০ বছরের ডাকবিভাগে ডাকহরকরা

হিমাদ্রি শেখর দাস

ডাকহরকরারা ছিল সে যুগে ডাক ব্যবস্থার প্রাণ। ডাক মাশুল থেকে কোম্পানির আয় হতো বছরে ৫০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত। মানি অর্ডার, পেনশন বিলি, স্বল্প সঞ্চয় থেকে শুরু করে গ্রামেগঞ্জে ম্যালেরিয়ার কুইনাইন বিক্রিও করেছিল ডাক বিভাগ।রবি ঠাকুরের 'শিশু' কাব্যগ্রন্থের 'ব্যাকুল' কবিতাটা মনে পড়ে ? মায়ের উদাসীন ভাব দেখে ছোট্ট ছেলেটা প্রশ্ন করে, ''আজকে বুঝি পাসনি বাবার চিঠি ?'' টেলিফোন, ইন্টারনেট পূর্ববর্তী যুগে প্রবাসী প্রিয়জনের খবর পাওয়ার অন্যতম মাধ্যম ছিল চিঠি। কাগজের গায়ে আবেগ মাখানো অক্ষর ঘরে ঘরে পৌঁছে দিত সুখ দুঃখের খবর, আর খবর পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব আজও পালন করে চলেছে যে সরকারি দপ্তর আজ সে আড়াইশো বছরের মহীরুহ।তবে শুরুর দিকে কলকাতা থেকে ওড়িশার গঞ্জাম, পাটনা, কলকাতা থেকে দিনাজপুর ও রাজমহল হয়ে ঢাকা এবং পাটনা থেকে বারানসী পর্যন্ত এই চারটি শাখায় চিঠিপত্র আদানপ্রদান হত কলকাতার জিপিও থেকে। পরে ধাপে ধাপে গোটা দেশে চিঠিপত্র দেওয়া নেওয়া শুরু হয়। গ্রিক স্থাপত্য রীতিতে নির্মিত এই ভবনের নকশা তৈরি করেছিলেন ওয়াল্টার.বি.গ্রেনভিল। ডাক ব্যবস্থার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত ডাক টিকিট। ১৮৫৪ সালে ডাক ব্যবস্থার সংস্কার সাধন করে ভারতে ডাক টিকিটের প্রচলন করেন লর্ড ডালহৌসি। রানি ভিক্টোরিয়ার ছবি সম্বলিত সেই ডাক টিকিট প্রচলিত ছিল প্রায় ১৯০০ সাল পর্যন্ত। স্বাধীনতার পর সেই বছরেই প্রকাশিত হয় স্বাধীন ভারতের প্রথম ডাক টিকিট, যেখানে ছিল জাতীয় পতাকার ছবি ও জয় হিন্দ স্লোগান। ১৯৬২ সাল থেকে হিন্দি হরফে 'ভারত' এবং ইংরেজিতে 'INDIA' লেখা ডাক টিকিট প্রকাশিত হয়ে চলেছে। বিভিন্ন সময় ভারতের ভিন্ন ভিন্ন ঐতিহ্যকে সম্মান জানিয়ে ভারত সরকার ডাক টিকিট প্রকাশ করেছে।

১৭৭৪ সালে ঢেলে সাজানো হয়েছিল পুরো ব্যবস্থাটাই। সরকারি ছাড়া সব চিঠির উপর ধার্য হল দূরত্ব অনুযায়ী নির্দিষ্ট মাসুল। শুধু দূরত্ব নয়, মাসুল ঠিক করতে চিঠির ওজনের হিসাবও করা হত। কাগজের টিকিট আসার আগেই চালু হয়েছিল দুই আনার তামার টিকিট। চিঠিপত্র বিলির জন্য খোলা হল চারটে রুট। কলকাতা থেকে ঢাকা, পাটনা, বারাণসী এবং গঞ্জাম। রুটকে আবার ভাঙা হত ৮-৯ মাইলের 'স্টেজে । ডাকের গতির উপর নজর রাখার জন্য মুর্শিদাবাদ, রাজমহল, মুঙ্গের, পাটনার মতো গুরুত্বপূর্ণ স্টেজে ছিল রাইটার, টাইম-কিপাররা।

১৭৭৪ সালের ৩১ মার্চ, বাংলার তৎকালীন গভর্নর জেনারেল লর্ড ওয়ারেন হেস্টিংসের হাত ধরে ফোর্ট উইলিয়ামে যাত্রা শুরু হয়েছিল কলকাতা জেনারেল পোস্ট অফিসের। তারপর দেখতে দেখতে কেটে গিয়েছে ২৫০ বছর। যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বদলাতে হয়েছে অনেক কিছুই। দুইশত পঞ্চাশ বছরের লোগো উন্মোচন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ওয়েস্ট বেঙ্গল সার্কেলের চিফ পোস্ট মাস্টার জেনারেল নীরজ কুমার, সিকিম এবং উত্তরবঙ্গের পোস্টমাস্টার জেনারেল অখিলেশ কুমার পাণ্ডে, দক্ষিণবঙ্গের পোস্ট মাস্টার জেনারেল এস.এস কুজুর এবং আরও বিশিষ্টজনেরা।২৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে ১৪ থেকে ১৯ মার্চ,২০২৪ আয়োজন করা হয়েছিল বিভিন্ন অনুষ্ঠানের। তার মধ্যে রয়েছে কলকাতা জিপিওর ওপরে অঙ্কন প্রতিযোগিতা, রয়েছে ডাকবিভাগকে কেন্দ্র করে ফটোগ্রাফি প্রতিযোগিতাও। চলন্ত ট্রামে আয়োজন করা হয়েছে প্রদর্শনীর। জলপথে হাওড়া থেকে দক্ষিণেশ্বর যাওয়ার পথে উন্মোচন করা হবে বঙ্গ তরী নামক বিশেষ ডাকটিকিটের। তিলোত্তমার ঐতিহ্যশালী বহুতল নিয়েও প্রকাশ করা হবে বিশেষ ডাকটিকিট। ২৫০ বছর উপলক্ষ্যে যে বিশেষ লোগো এদিন উন্মোচিত হয়েছে তাতে তুলে ধরা হয়েছে জিপিও অফিস এবং ঐতিহাসিক হাওড়া ব্রিজকে। যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে ডাক বিভাগের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে লোগোতে তুলে ধরা হয়েছিল হাওড়া ব্রিজকে।

এই দেশীয় কর্মচারীদের মাথার উপর থাকতেন ইউরোপীয় ডেপুটি পোস্টমাস্টার। আর সবার উপরে পোস্টমাস্টার জেনারেল। তাঁর কাছে পাঠাতে হত

রিপোর্ট আর আয়-ব্যয়ের হিসাব। যত সময় গড়াল, খোলা হল আরও নতুন নতুন রুট।

তবু সমস্যা কিছু রয়েই গেল। এক-এক প্রদেশে পোস্ট অফিসের কাজের ধরন ছিল এক-এক রকম। নিয়মকানুন আলাদা, আলাদা ছিল ডাক মাসুলও। পরিষেবা ছিল সীমিত। মাত্র কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ শহরের মধ্যে নির্দিষ্ট কিছু পথে পৌঁছে দেওয়া হত চিঠিপত্র। স্থানীয় স্তরে আলাদা বিভাগও ছিল না। জেলার কালেক্টররাই ছিলেন স্থানীয় পোস্ট অফিস দেখাশোনার দায়িত্বে। সেনা ছাউনিতে আধিকারিকই সামলাতেন পোস্টমাস্টারের কাজকর্ম। ডাকটিকিটের বালাই ছিল না। মাসুল নেওয়া হত দূরত্ব অনুযায়ী, আর বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এই দূরত্ব ঠিকঠাক জানা না থাকায় বিভাগীয় কেরানির হত পোয়াবারো। দু'পয়সা আমদানির সুযোগ থাকায় চাকরিটা ছিল বেশ লোভনীয়। এই বাঁকা পথে প্রাপ্তিটুকু বাদ দিলে দেশি ও সায়েব কর্মচারিদের মধ্যে বেতন-বৈষম্য ছিল চোখে পড়ার মতো।

ডাক ব্যবস্থার অবস্থা খতিয়ে দেখতে ১৮৫০ সালে বসেছিল কমিশন। কমিশনের দীর্ঘ অনুসন্ধান এবং আলাপ-আলোচনার পরিণতি ১৮৫৪-এর পোস্ট অফিস অ্যাক্ট। এই আইনে ডাক বিভাগ প্রাদেশিক দফতর থেকে বদলে গেল কেন্দ্রীয় দফতরে। একক প্রশাসনাধীন বিভাগের মাথায় বসলেন ডিরেক্টর জেনারেল। ওজন বাড়ল ডাক বিভাগের সর্বোচ্চ প্রশাসনিক আধিকারিকের। নতুন আইনে সারা দেশে একই হারে মাসুল বসল, নগদে মাসুল দেওয়ার বদলে এল ডাকটিকিট। কর্মী-সঙ্কট সামলে প্রত্যন্ত এলাকায় ডাক পৌঁছে দিতে উপ-ডাকঘরের দায়িত্ব তুলে দেওয়া হয় স্কুলমাস্টার, দোকানদার বা মোটামুটি হিসাব করতে জানা লোকের হাতে, এ যুগের ভাষায় যা 'আউটসোর্সিং'। যাবতীয় নিয়মকানুন সঙ্কলন করে ছাপা হল চার খণ্ডের মোটাসোটা পোস্ট অফিস ম্যানুয়াল। একমাত্র ডিরেক্টর জেনারেলের ব্যক্তিগত সহকারী ছাড়া সেই বিশাল ম্যানুয়াল কেউই বিশেষ পড়তেন বলে মনে হয় না। তিনিই প্রয়োজনে 'সিধুজ্যাঠা'র ভূমিকা নিতেন। রেলের পাশাপাশি ডাক বিভাগের কাজে যোগ দিয়ে বাঙালিরা দলে দলে ছড়িয়ে পড়ল গোটা উপমহাদেশে।

''রাত নির্জন, পথে কত ভয়, তবুও রানার ছোটে, / দস্যুর ভয়, তারো চেয়ে ভয় কখন সূর্য ওঠে''- সুকান্ত ভট্টাচার্যের 'রানার' কবিতার এই দু'লাইনেই ধরা আছে রানার বা ডাক-হরকরাদের জীবন যন্ত্রণা। ইংরেজ আমলের এই মেল-রানার বা ডাক-হরকরাদের কাজটা ছিল আরও কঠিন এবং বিপজ্জনক। বন্যায় নদীতে ভেসে যাওয়া, হিমালয়ের তুষারে তলিয়ে যাওয়া, ডাকাতের হাতে পড়া বা জঙ্গলে বাঘের পেটে যাওয়ার মতো ঘটনা ঘটত হামেশাই। এত বিপদ মাথায় নিয়েও চিঠির ব্যাগ রক্ষা করতে তাঁরা ছিলেন মরিয়া। ঠিক সময়ে তাঁদের ডাক পৌঁছে দেওয়ার দক্ষতা প্রায় মিথে পরিণত হয়েছিল। মাসিক বারো টাকার মতো সামান্য বেতন পেয়েও তাঁদের সততায় ঘাটতি ছিল না। শুরু থেকেই ডাক ব্যবস্থার মূল চালিকাশক্তি ছিলেন রানার বা ডাক-হরকরারা। রেল-যোগাযোগ গড়ে ওঠার পর তাঁদের উপর নির্ভরতা খানিকটা কমলেও ডাক পরিবহণে তাঁদের প্রয়োজন ফুরোয়নি। উনিশ শতকের শেষেও সারা দেশে তাঁদের ছুটতে হত ৮৫,০২৩ মাইল। ১৮৫৫-৫৬ অর্থবর্ষের বার্ষিক প্রতিবেদন অনুসারে, বাংলা প্রেসিডেন্সিতে রেল, ডাকবাহী যান, নৌকো ইত্যাদি মাধ্যমের চেয়েও বেশি পথ অতিক্রম করেছিলেন রানাররা।

শতাংশের হিসাবে সবচেয়ে বেশি পরিমাণ চিঠি সারা দেশে পৌঁছে দিতেন রানাররা। রানারদের উপর এই ভরসার কারণ খানিকটা অর্থনৈতিক। যানে চিঠি বা পার্সেল পাঠানোর খরচ ছিল মাইলবাহী প্রায় বারো টাকা, সেখানে মাইলপ্রতি মাত্র আনা খরচেই রানাররা ডাক পৌঁছে দিতে টাকা কিলোগ্রাম ওজন পিঠে নিয়ে। মেল বেশি যেতো কলকাতা-নাগপুর রুটে। দামি কিছু পাওয়ার আশায় ডাকাতদের নজর ছিল বাঙ্গি বা পার্সেল মেলে। হরকরাদের এমন বিপদের মুখে ঠেলে দিয়ে ডাক বিভাগ কিন্তু হাত গুটিয়ে বসে থাকেনি। ব্যবস্থা ছিল হরকরাকে পাহারা দেওয়ার, রাস্তার পাশে জঙ্গল পরিষ্কারের, এমনকি প্রয়োজনে বাঘ মারারও। তবু অনেক সময়ই ঘটে যেত চরম অঘটন। ১৮৭০-এর দশকে এক রানারের এলাকায় উপদ্রব হয়েছিল মানুষখেকো বাঘের। এক দিন সন্ধে নাগাদ গ্রামের আশপাশে বাঘের দেখা মেলায় সেখানকার লোকজন

তাঁকে পরদিন সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বলে। খবর ছিল, সেই বাঘ একটু তাড়াতাড়িই খাওয়াদাওয়ার পাট চুকিয়ে ফেলে। তাই বিকাল পাঁচটা অবধি অপেক্ষা করে গ্রামের চৌকিদারকে সঙ্গে নিয়ে কর্তব্যপরায়ণ রানার বেরিয়ে পড়েছিলেন জঙ্গলের পথে। খানিক যেতেই তাঁরা পড়লেন বাঘের মুখে। চৌকিদার কোনও রকমে ডাক ও প্রাণ নিয়ে পালাতে পারলেও বেঘোরে প্রাণ হারান সেই হরকরা। কর্তব্যরত অবস্থায় মৃত্যু। তা ছাড়া কাজটাও খুব সাহসের। তাই সরকারি নিয়মমাফিকই তার অনুতোষিকা প্রাপ্য ছিল। কিন্তু আপত্তি জানায় অডিট বিভাগের আধিকারিকরা। যুক্তি ছিল, ডাক পৌঁছে দেওয়া হরকরার নিয়মিত কাজের মধ্যে পড়ে। তাই সেটা করতে গিয়ে বাঘের পেটে যাওয়া মোটেই বিশেষ সাহসের কাজ নয়, কাজের ঝঞ্ঝাটমাত্র। শেষ পর্যন্ত তাদের এই যুক্তি ধোপে টেকেনি। ডাক বিভাগের তৎকালীন অ্যাকাউন্ট্যান্ট-জেনারেল লেভেট ইয়েটস তাদের কর্তব্য সমঝে দেন কড়া ভাষায়। রানারদের এই কর্তব্যনিষ্ঠা আর মাসিকতার প্রশস্তি না করে পারেননি নানা সময়ে ভারতীয়দের কড়া সমালোচক জোসেফ।

প্রথম দিকে অনেকেই বুঝে উঠতে পারেননি, পোস্টকার্ডের ঠিক কোন দিকে ঠিকানা লিখতে হবে। ভেবেছিলেন, ভুল দিকে লিখলেই বা ক্ষতি কী? আর কাল ঘাম ছুটত পোস্ট অফিসের চিঠি বাছাই করার লোকজনের। শুধু পোস্টকার্ড কেন, যে কোনও চিঠিই প্রাপকের কাছে পৌঁছে দেওয়াটা ছিল রীতিমতো একটা চ্যালেঞ্জ। একে তো এতগুলো ভাষায় লেখা ঠিকানা, বেশির ভাগ হাতের লেখাই অপাঠ্য, তার উপর গ্রাম বা শহর সর্বত্রই লোকজনের ঠিকানা লেখার অভিনব সব পদ্ধতি। রাস্তার নামধাম-সহ নির্দিষ্ট ঠিকানার বালাই নেই। ঠিকানার সঙ্গে মিশে থাকত ঠাকুর-দেবতার আবাহন। কোনও ব্যক্তির পেশা, বা যে বাজারঘাটে সে প্রায়শই যেত-সেটাই ঠিকানা বলে লিখে দেওয়া হত। নদী-নালার দেশে চলন্ত নৌকার মোটামুটি একটা হদিস দিয়ে ঠিকানার কাজ চালানো হত। স্থানীয় লোক হওয়ায় পিওন তাকে খুঁজে নিতেন। এমনকি 'কানা অমুক' বা 'ট্যারা তমুক'-এর মতো, দৈহিক ত্রুটিকে ঠিকানা হিসেবে ব্যবহার করলেও প্রাপকের আপত্তি ছিল না। তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়ানো মানুষের কাছে চিঠি পৌঁছে দেওয়ার জাদুও পিওনদের জানা ছিল। এ বার ঠিকানা লেখার একটা উদাহরণ পেশ করা যাক-ক্ষ্মযিনি আমার হৃদয় থেকে অবিচ্ছেদ্য, ভাগ্যবান বাবু শিবনাথ ঘোষ, যাঁর হৃদয় আমার হৃদয়ের মতোই। পোস্ট অফিস হাসনাবাদ থেকে রামনাথপুর গ্রামের দিকে, ভাগ্যবান বাবু প্রিয়নাথ ঘোষের বাড়িতে পৌঁছানোর জন্য, জেলা চব্বিশ পরগণা। এই চিঠি প্রাপক ছাড়া অন্য কোনো ব্যক্তিকে দেবেন না, পোস্টম্যানবাবু এটাই আমার আপনার কাছে অনুরোধ। সব ঝুটঝামেলা সামলে চিঠিপত্র প্রাপকের কাছে পৌঁছে দিতে ডাক বিভাগের ১২০০ মিলিয়ন চিঠিচাপাটির মধ্যে ঠিকানায় পৌঁছাতে পারেনি মাত্র ০.২২ শতাংশ। পিওনরা ইংরেজি পড়তে না পারলেও চিঠি বিলি করত নির্ভুল ভাবে। আজকের দিনে নিরক্ষর বা সামান্য পড়তে পারা মানুষজন যে ভাবে, এ, বি, সি ইত্যাদি ব্যবহার করে মোবাইলে অন্যের নম্বর তুলে রাখেন, পদ্ধতিটা অনেকটা সেই রকম। ১৮৫০-এর মে মাসে কমিশনের সামনে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে কলকাতার পোস্টমাস্টার জেনারেল ডব্লিউ টেলর সেই পদ্ধতির চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন। পিওনরা চিঠি সংগ্রহ করেই সেগুলোর ওপর লিখে রাখতেন অর্থপূর্ণ কোন চিহ্ন (ধোবিচিহ্ন) বা সংক্ষিপ্ত আকারে কিছু শব্দ।

সরকার বাহাদুরের লোক মানেই ভীতিপ্রদ। কিন্তু সরকারি কর্মচারী হওয়া সত্ত্বেও পিওনদের সঙ্গে সাধারণ মানুষের গড়ে উঠেছিল আত্মিক সম্পর্ক। দুর্গম জায়গায় এই ডাকপিওনরাই মানুষের কাছে হয়ে উঠলেন বাইরের জগতের জানলা। শুধু বিলি নয়, চিঠি পড়ে বুঝিয়ে বা লিখে দেওয়ার কাজও তাঁদের করতে হত। তাঁদের সঙ্গে মন খুলে আলোচনা করা যেত যে কোনও পারিবারিক সমস্যা। তাই নিয়মিত না এলেই তাঁর বিরুদ্ধে জমা পড়ত অভিযোগ।

টিকিট না লাগালেও চিঠি পৌঁছবেই- এ বিশ্বাসে আস্থা রেখেছিল আমজনতা। ডাক বিভাগের ডিরেক্টর জেনারেল বার বার নির্দেশ জারি করেও মাসুলবিহীন চিঠির সমস্যা মেটাতে পারেননি। এর মধ্যে একটা চালাকিও ছিল। পোস্টকার্ড মানে খোলা চিঠি, না খুলে

পড়ার সুবিধা ছিল। তাই প্রাপকও চিঠি পড়ে নিয়ে অম্লানবদনে সে চিঠি তার নয় বলে ফেরত দিত ডাকপিওনকে। প্রেরকও গোপন রাখত নিজের পরিচয়। ফলে কারও থেকেই ডাকমাসুল আদায়ের উপায় থাকত না। শুধু 'নেটিভ'দের থেকে নয়, ইউরোপীয়দের থেকে মাসুল আদায় করতেও পিওনদের কালঘাম ছুটে যেত। পুরো ব্যাপারটা ত এতটাই বাড়াবাড়ির পর্যায়ে চলে যায় যে, বিশ শতকের শুরুতে ডাকমাসুলবিহীন পোস্টকার্ড পাঠানোর বন্দোবস্তটাই ডাক বিভাগ তুলে দিল।

এ দেশের মানুষ সায়েবদের আনা যে কোনও জিনিসই দেখত সন্দেহের চোখে, তা সে ডালডা হোক বা চা। ১৮৭৯ সালে পোস্টকার্ড চালু হলে ঘটল একই ঘটনা। মানুষের বদ্ধমূল ধারণা ছিল, খোলা পোস্টকার্ড ডাক বিভাগের লোকজন বিলির আগে পড়ে ফেলে। তাই চিঠিকে অবোধ্য করার জন্য হাতের লেখা হত অপাঠ্য। ১৮৭৯ সালের ১৮ জুলাই অমৃতবাজার পত্রিকায় লেখা হচ্ছে, ইঙ্গিতপূর্ণ ভাষায় লেখা চিঠির অর্থ শুধু ডাক বিভাগের লোকজন কেন, প্রাপকের পক্ষেও উদ্ধার করা ছিল দুষ্কর। সে সময় সরকারি পোস্টকার্ডের পাশাপাশি চালু ছিল বেসরকারি পোস্টকার্ডও। পছন্দের ঠাকুর-দেবতার ছবিওয়ালা বেসরকারি পোস্টকার্ডের ঊর্ধ্বমুখী চাহিদা বেশ চাপে ফেলেছিল সাধারণ সরকারি পোস্টকার্ডের বিক্রিকে। তবু দাম কম হওয়ার জন্য সরকারি পোস্টকার্ডের বিক্রিবাটা ছিল ভালই। লোকে সেই সস্তার পোস্টকার্ডের দামও উসুল করত এক বিন্দুও জায়গা না ছেড়ে। এমনকি যেখানে কিছু লেখার কথা নয়, ছাড়ত না সেই জায়গাও। অনেকের ধারণা ছিল, সরকারি বা বেসরকারি যে উপায়েই পাঠানো হোক না কেন, চিঠি সব সময়েই লিখতে হবে পোস্টকার্ডে। এমনই নাকি সরকার বাহাদুরের হুকুম। তাই এক ভীষণ অনুগত জমিদার গোমস্তার কাছে তাঁর মহান চিন্তাভাবনা পৌঁছে দিতে খরচ করেছিলেন খান দশেক পোস্টকার্ড। অনেকে আবার পোস্টকার্ডে চিঠি লিখে খামে ভরে লাগিয়ে দিতেন আধ আনা মূল্যের স্ট্যাম্প। ফলে চিঠি লেখা হয়ে উঠল খরচসাপেক্ষ। সরকারের এই অযৌক্তিক আদায়ের বিরুদ্ধে জোরালো হল প্রতিবাদ, হইচই শুরু করল দেশীয় কাগজগুলোও। আয় নেহাত মন্দ হত না। ১৯১৮ সালের বার্ষিক হিসাবে দেখা যাচ্ছে, সে বছরের লাভের অঙ্ক ছুঁয়েছিল পঞ্চাশ লক্ষ টাকা। অবশ্য সরকারের দাবি ছিল, ডাক বিভাগকে তারা কখনওই আয় বাড়ানোর দফতর বলে ভাবেনি। যে উদ্বৃত্ত পাওয়া যেত, তা সাধারণত খরচ করা হত বিভাগের উন্নতিকল্পেই। বিশ শতকের শুরুতে এক বার ডাক মাসুল এতটাই কমানো হয়েছিল যে, ডাক বিভাগ আর্থিক ক্ষতির মুখোমুখি হয়েছিল। তবে ডাক পরিষেবা চালু হওয়ার একেবারে প্রথম দিকে, ১৭৯৮ সালে লর্ড ওয়েলেসলি বাড়িয়েছিলেন চিঠির মাসুল। নতুন হার চালু হওয়ার প্রথম মাসেই আয় বেড়েছিল সাড়ে চার হাজার টাকার বেশি।

আয় বাড়ানোর তাগিদে চিঠিপত্র বিলির সঙ্গে সম্পর্কহীন হরেক কাজ চাপল ডাক বিভাগের কাঁধে। আধিকারিকদের যাতায়াতের জন্য কোম্পানির বাহিনীর হাতে পালকি পরিবহণ ব্যবস্থা ছিল সেই ইঙ্গ-মরাঠা যুদ্ধের সময় থেকেই। ১৭৮৩ থেকে তা কাজে লাগানো হল ডাক পরিবহণে। অনেকসময় সরকারি কাজে না লাগলে ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ভাড়া দেওয়া হত সেই পালকি। কখনও কখনও মানুষ আর ডাক যেত একই পালকিতে। এ কালের হিসাবেও ভাড়া নেহাত কম ছিল না। কলকাতা থেকে সর্বোচ্চ দূরত্ব বারাণসীর ভাড়া প্রথমে ছিল ৭৬৪ টাকা, পরে কমে হয়েছিল ৪৪৫ টাকা। যাত্রাপথে বিশ্রামের জন্য ১৫ থেকে ৫০ মাইল ব্যবধানে ছিল বিশ্রামাগার, নাম ডাকবাংলো। সেখানে পয়সা দিলে পাওয়া যেত থাকা, পছন্দ মতো খাওয়ার সুযোগ। এ ছাড়া, মানি অর্ডার, পেনশন বিলি, স্বল্প সঞ্চয় থেকে শুরু করে ব্যবসায়ীদের জিনিস পৌঁছে দিয়ে তার দাম উসুল করা, এমনকি গ্রামেগঞ্জে ম্যালেরিয়ার দাপট সামলাতে কুইনাইন বিক্রি করাও ছিল ডাক পরিষেবার অন্তর্ভুক্ত। এর মধ্যে মানি অর্ডারের দায়িত্ব সরকারি তোষাখানা থেকে তুলে দেওয়া হয়েছিল ডাক বিভাগের হাতে। প্রস্তাব এসেছিল রেলের টিকিট বিক্রিরও। আপত্তি উঠেছিল ডাক বিভাগের তরফে। এ সব করতে গিয়ে তাদের আসল কাজটাই ভন্ডুল হবে, বিভাগ হারাবে কুলীনত্ব। নিয়তির এমনই পরিহাস যে, আজ ডাক বিভাগ ব্যবসা বাড়াতে তৎপর হয়েছে এমনই নানা অকুলীন পরিষেবা দিতে।

রম্য রচনা

বিরাট সাহেবের যোগ ব্যায়াম

অনুপম বিশ্বাস

বিরাট সাহেব পাড়ার সবচেয়ে 'ফিট' মানুষ ছিলেন - মানে, মুখে কথার 'ফিট ফিটানি' খুব ভালো ছিল। বয়স পঞ্চাশ পেরিয়েছে, কিন্তু মনের বয়স এখনও আঠারোতেই থেমে। একদিন সকালে দেখলাম তিনি পাড়ার পার্কে নতুন লুক নিয়ে হাজির - হাতে যোগা ম্যাট, গায়ে রঙিন টি-শার্ট (যেটায় লেখাল্ল 'বডি ফিট, মাইন্ড হিট'), আর কপালে ছোট্ট একটা তিলক। বসেই বললেন, ''আজ থেকে আমি নিয়ম করে যোগ করব। ভারতীয় সংস্কৃতির গর্ব বুঝলে ?'' আমরা সবাই চুপচাপ বসে রইলাম। কেউই সাহস করিনি বলতে যে উনি গতকাল হালিম আর ফালুদার প্রতিযোগিতা জিতে 'বডি ফিট' করতে এসেছেন।

প্রথম দিনেই শুরু হলো 'সূর্য নমস্কার'। তবে সূর্য ওঠার আগেই উনি তিনবার পড়ে গেলেন। বললেন, ''মাটিতে প্রেম আছে,তাই বারবার টানে।'' পরের আসনে গেলেন 'ভুজঙ্গাসন' করতে। তবে দেখতে লাগল যেন উনি সাপ নয়,বরং কষ্টে কুণ্ডলী পাকানো ঝাঁপসা কুমির।

এক বৃদ্ধা এসে বললেন, ''বাবা, তুমি ঠিক আছো তো?''

উনি বললেন, ''আছে'' কেবল মেরুদণ্ডটা মনে হচ্ছে নিজের নয়।'' তবে এসব কিছুর মধ্যেও বিরাট সাহেব দমেন না। তিনি 'প্রাণায়াম' শুরু করলেন এমনভাবে, যেন সামনে বসে থাকা মানুষগুলো হঠাৎ বাঘের গর্জন শুনছে। এক শিশুর মা কান ধরে ছেলেকে টেনে নিয়ে গেল,বললেন, ''এই পাগলটা আবার নিঃশ্বাস ফেলে ভূমিকম্প ডাকবে !''

তৃতীয় দিন উনি নিজেই বললেন, ''আজ থেকে আমি আমার অনলাইন ক্লাস চালু করব - 'যোগা উইথ বিরাট'!''

আমরা ভাবলাম, ''এবার বুঝি ইউটিউবও হাঁপিয়ে উঠবে।'' তার ভিডিওতে উনি মাঝে মাঝে ভুল আসন করে ফেলেন, তারপর বলেন, ''এটা এক্সপেরিমেন্টাল ভার্সন,প্রাচীন কালেও হতো।''

একবার উনি এমন এক ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে ছিলেন,যেটা দেখে এক ছেলে বলল, ''এইটা কী আসন?''

উনি বললেন, ''এইটা 'WiFi আসন',সিগন্যাল ধরার জন্য।''

একদিন পাড়ার এক সত্যিকারের যোগা শিক্ষক এলেন। তিনিও বিরাট সাহেবের ক্লাসে উপস্থিত।

তিনি বললেন, ''আপনি যেটা করছেন, ওটা আসনে নয়, হাসনে।'' বিরাট সাহেব হেসে বললেন, ''হাস্যযোগও তো একটা যোগ,ভাই !''শেষ পর্যন্ত পাড়া মেনে নিল - বিরাট সাহেব যোগা না পারলেও,যোগা নিয়ে হাসানোর এক চূড়ান্ত ক্ষমতা রাখেন।আর তিনিও গর্ব করে বললেন, ''যোগ ব্যায়াম না হোক,যোগ-রস তো হয়েই গেছে !''

With Best Compliment from

GANGESHNAGAR S.K.U. S LTD

GANGESHNAGAR, SAHABAZAR

HOOGHLY–712402(WB)

MOBILE- 7585842877

কবিতা ও ছড়া

তারাটি

জুমেলী সরকার

কোন কোন দিন তুমি
রূপসী গাঁয়ের গা ঘেঁষে
বয়ে চলা স্ফটিক নদীটি
কত জনমের চেনা সুর
মহুয়াগন্ধি বুকের ওম...

সেই সব ঋজু দিনে কসমস
ভুলে যায় কঠিন অঙ্কের সূত্র
লিথিয়ামের - সময় ভেসে যায়
অনুগল্প থেকে মহাকাব্যে
লগ্ন হয়ে থাকে অপার্থিব আলো

তবু কার যে তর্জনীর ইশারায়
নটে গাছটি মুড়ানোর আগেই
বেজে ওঠে অচেনা বিউগেল
আত্মগোপনকারী বিদ্যুৎফলা
আঘাত হানে আচম্বিতে

এমন দিনে নাবিক পথ হারায়
তিরতির কাঁপে প্রদীপ- শিখা
নিম্বোস্ট্রেটাসের গর্জনে
যা কিছু মঙ্গলময় উজ্জ্বল
বাজেয়াপ্ত হয় অদ্ভুত আঁধারে

আর আমি মৃত তারাটির মতন
জ্বলজ্বল করি রাতের আকাশে !

অনুভবের অনুভূতিতে

কেতকী বসু

গভীরতার চিহ্ন বুঝতে যে সময় পার হয়ে যায়
সেখানে শ্রম আর শিক্ষা দুই সমান্তরাল রেখা
শিক্ষা আর অশিক্ষার অন্ধকারে
ভাষারা এখন বাক্য হিনা,
পাঁচিলের ঘেরাটোপের মধ্যে লক্ষ্য করুন আর্তনাদ
বেঁচে আছে শুধু জীবন্ত লাশ হয়ে।

অতিক্রমের রাস্তা আজ বন্ধ
খোলা আছে শুধু চোরাপথের অন্ধ গলি
চেনা অচেনা কতো কিছুই চোখে পড়ে
সময়ে অসময়ে এগিয়ে গিয়েও পিছিয়ে আসতে হয়
জানি এ অন্ধকারেই আমাদের মৃত্যু
তার আগে আরো একবার মুক্তি আসুক আমাদের চোখে।

কারা রক্ষী উদাসীনতায় প্রমাণ হয় নির্লজ্জতার
উচ্ছিষ্ট বাসনে যে দাগ সে আর মোছার নয়
চারিদিকে শুধু বিভীষিকার আর্তনাদ
যে মৃত্যু নিয়ে চির বিদায় জানিয়ে চলে গেল
তারই ক্রন্দনে উত্তাল আজ সমস্ত মানুষ
প্রমাণ হলো একবার আমরা আর কেউ ঘুমিয়ে নেই।
সাজানো রাস্তার পাশে ছড়ানো জমি দেখে
ইচ্ছেমত আয়তনের হিসেব দেখি
মাথার ওপর প্রখর তাপে বিশ্রাম নিতে
কত চোখ দেখে চলেছি ,আকারে ইঙ্গিতে
সহসা ভয় আর ঘৃণা জন্মালে এগিয়ে যাই
হাতের নখ আর দাঁতের প্রমাণ দিতে
প্রতিবাদের ভাষা তৈরি হয় নিজেদের মধ্যে
তারপর
দৃষ্টির তীক্ষ্ণতা কমে এলে হাতের ধাক্কায় পড়ে থাকে মাটিতে
সৃষ্টি হয় আর এক নতুন ইতিহাস ।

চোখ রে আমার চোখ

বিজন দাস

চোখ রে আমার চোখ
কত দেখার ঝোঁক
কৌতুহলের কাতুকুতু
আর সয় না আতুপুতু
গোপন কিছু দেখার জন্যে
কেবলই ছোঁক ছোঁক,
বকে দিয়ে বলি ও চোখ
নিজেকে তুই রোখ,
ফালতু ঝোঁকে ঝাঁপটি দিলে
ফি পাওয়া যায় শোক।

স্বভাব যায় না মলে
চোখটা দেখি ঠিক চলে যায়
নিষিদ্ধ অঞ্চলে।
ঘটতে পারে কী ?
মিষ্টি করে ফার্স্ট হুমকি
কিচ্ছু দেখেননি।
(দাদা) কিছু দেখেনি।

চোখের সামনে ভয় মেশানো
মিষ্টি হাসির মোয়া
বেশি রিসকে যেতেও পারে
সাধের প্রাণটি খোয়া।

ঠেকে ঠকে বুঝে গেছি
আসল সত্যিটি
আড় চোখে সব দেখেও বলি
কিচ্ছু দেখেনি তো ভাই
কিচ্ছু দেখেনি।

স্বচ্ছতার আলোয়

ডাঃ সেখ সাবের আলি

পুলিশ খুঁজে বেড়ায় অচেনা চোরকে
হাটে বাজারে চেনা লোকের ভীড়ে,
চোর ঢেকেছে মুখ, মেখেছে কালি
কেউ সাধু সেজে বেড়ায় ঘুরে।

চোর ধরতে পুলিশ হন্যে হলো
অসচেতন পুলিশ ফিরে এলো ঘরে,
অচেনা বহুরূপী কত রকমের চোর
রাতে পুলিশের সাথে বন্ধুত্ব করে ।

নিত্য চলছে চোর পুলিশের খেলা
লজ্জার মাথা খেয়ে খোলা মাঠে,
সবুজ ঘাসের উপর, শিশির ভেজা
মাটিতে, আকাশের নীচে প্রতারক ঠোঁটে ।

চোর ধরা পুলিশের মিথ্যা অঙ্গীকার
নিভিয়ে আলো অন্ধকার করে পথ,
শূন্য পকেট পূর্ণ হয়, চোখের আড়ালে
চোর ধরা, পুলিশের মিথ্যা নৈতিক শপথ।

যে চোর লুকিয়ে থাকে আপন ঘরের কোণে
গহীন বনে, অন্ধকারে আড়ম্বরে সুখে,
এই চোর, যায় না চেনা, যায় না ধরা
গুরু না চেনালে, না দেখালে চোখে।

সচেতন হও, প্রেম করো গুরুর সাথে
সহজ হবে চোরকে চিনে ধরা,
আসল নকল, চোর পুলিশ, সব একাকার
স্বচ্ছতার আলোয় আলোকিত হবে বসুন্ধরা।

এখন কেমন আছ সুতপা
শাশ্বত বোস

ট্রায়াঙ্গুলার পার্কের পেছনে উন্মুক্ত,শান্ত,
কোন এক চায়ের দোকানে, তোমার দুচোখে
তখন দীঘল চাঁদের লুকোনো কার্তুজ !
ভিড় মেখে সরে যাওয়া সেই ঘুগনী কাকু,
যার মুখ দেখে অনুকবিতারা পাল তোলে
ফ্ল্যাটবাড়ির ছায়ায়, শুনেছি তাঁরও বাড়িতে
আধপেটা মেয়ে আছে। জন্মান্তরে হয়তো
সেও একদিন সুতপা হবে!
গোলগাল, কৃষ্ণাঙ্গী, সুলেখিকা !
ইদানীঙ সমুদ্রমন্থনে নীল তিমির রহস্য জানি।
তোমার সাথে শেষ দেখার পর এখন ওই পার্কটা
একলা পরে থাকে, ফুরিয়ে আসা সেদ্ধ মটরের
সুগন্ধটাকে বুকে করে, আস্তে আস্তে
ফকির হয়ে যাওয়া বিপ্লবের মত!
ঘুগনী কাকু ঘুগনী বেঁচে, মশলা মেশায়।
ঘাম আর থুতুর মাঝে
জীবন আর হিংসা পাশাপাশি শুয়ে থাকে কবরে!
তপ্ত বৈশাখে হয়তো একদিন শুনতে পাব
কবিতা লিখে তুমি পুরস্কার পেয়েছ !
দুর্ভিক্ষে তলিয়ে যাওয়া শীতল কবিতা জড়িয়ে,
এখন কেমন আছ সুতপা ?

বিশেষ বিশেষ দিনে
সুভাষিতা ঘোষ (দাস)

বিশেষ বিশেষ দিনে মনে পড়ে যে কথা
আমি বুঝি না
সে কি প্রশান্তির উষ্ণ বাতাস?
না কি আমার নির্মম মৃত্যুদণ্ড!
সাদা পাতার দিকে তাকালে
শ্বাস নিতে কষ্ট হয়
রঙীন পাতায় চোখ ভারী হয়ে আসে খুব,
বুকের ভিতর ধূসর নদীর ঢেউ
হৃদয়ের উপর হেঁটে যায় কালো শোক!
বিশেষ বিশেষ দিনে
গভীরের টান ফুটে ওঠে হাতের রেখায়
কপালের উপর সম্পর্কের নির্বাসন...

মেঠো পথ
আজিজ উন নেসা

গ্রামের মাঝ দিয়ে,মেঠো ওই পথটি ধরে
চলে যায় ফেরিওয়ালা সাইকেলে করে,
হেঁকে যায় - ''চুরি চা.খ.য় , চা....য় বালা,
চায় না কি গো দিদিমণিরা, রঙিন মালা ?''
গ্রামের সব বৌদিমনিরা উৎসুক চোখে,
ফেরিওয়ালার ঝাঁকা পানে চেয়ে দেখে ;
''আছে আলতা সিঁদুর ?'' গুটি গুটি পায়ে
প্রশ্ন করে মাথার ঘোমটাটি টেনে গায়ে।
শিশু বালিকারা হাঁকটি শুনে আসে দৌড়ে -
কিছু টাকা মুড়ে নিয়ে হাতের মুঠোয় পুরে ;
ফেরিওয়ালা সারাদিন গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে,
চলে যায় অক্লেশে পাকা মেঠোপথটি ধরে।
গ্রামের মানুষও কাজে যায় মেঠোপথ ধরে,
বাঁশিতে সুর তুলে রাখালেরা গরু নিয়ে ফেরে,
ছেলেমেয়েরা দলে স্কুলে যায় সাইকেলে করে,
পাকা মেঠোপথ রয় সাক্ষী যুগ-যুগান্ত ধরে !

নির্বাক জোৎস্নার গল্প
এরশাদ

জোৎস্না ভেজা নীরব রাত
আলোর ঢেউয়ে ডুবে থাকে ব্যাকুলতা -
ইচ্ছে আর অনিচ্ছের ছায়া
খেলে যায় আত্মার আঙিনায়।

অন্তর্লীন এক জীবন,
রহস্যে মোড়ানো স্বপ্নের চিত্রনাট্য।
বাস্তবতার আঁচলে ঢেকে যায় সম্পর্ক -
নামহীন, মুখহীন এক প্রতিচ্ছবি।

নিঃশব্দ সেই অপার ব্যথা
শুধু জেগে থাকে চোখের কোণে,
জল না হয়ে নেমে আসে হৃদয়ে -
একান্ত, একা, অথচ জীবন্ত।

মন রাঙানো শরৎ
সুজন দাশ

নীল আকাশে ভাসছে মেঘের ভেলা,
শুভ্র সাজে খেলছে রঙের খেলা !
নদীর তীরে দুগ্ধ ধবল কাশে,
দেখে তারে অবাক হাসি হাসে !
কাশও যেন মেঘের সাথে মিলে,
টানছে নজর তুলছে যে ঢেউ দিলে !
রৌদ্রকিরণ ঝিলিক হাসি হেসে,
বলছে আমায় যাবি মেঘের দেশে ?
যেতে তো চাই কে আমাকে নেবে ?
অক্ষমতায় মরছি শুধু ভেবে!
হেঁটে এসে দেখি দিঘির জলে,
হাত ইশারায় ডাকছে শতদলে।
বলল আমায়, কোথায় ছিলি দূরে ?
মুগ্ধ হেসে গাইলো যেন সুরে !
পাপড়ি মেলে ভাসছে যেন রূপে,
মজে আমি চাইছি চুপে চুপে।
চোখ ফিরাতেই দেখি গাছের তলে,
শিউলি রানী উঠল কথা বলে !
যত্নে তারে যেইনা নিলাম তুলে,
বলল আমায় পড়াস প্রিয়ার চুলে।

চাঁদের হাসি
প্রতীতি সরকার

একাদশীর আধখাওয়া চাঁদটা
একবার আমায় প্রশ্ন করেছিল-
'তোমার ধর্ম কী?'
বলেছিলাম-
'দেখছো না আজ আমার একাদশীর উপবাস!'
আশ্বিনের এক চতুর্দশীর রাতে পাশের বাড়ির বউটা
ছাদে উঠে ফুল-জলের আয়োজন করেছিল
চাঁদ তাকেও জিজ্ঞাসা করেছিল-
'তোমার কী ধর্ম?'
সে হাতে ঝাঁঝরি তুলে চাঁদের চোখে চোখ রেখে বলেছিল
'আজ যে আমি তোমায় দেখেই উপোস ভাঙবো।'
পূর্ণিমার জ্বলজ্বলে চাঁদটা
পথচলতি মেয়েটাকে আচমকা ডেকে বলল
'তোর ধর্ম কী?'
মেয়েটা থতমত খেয়ে তোতলাতে লাগল।
আসলে ছোট্ট মেয়ে রাখি কিনতে বেরিয়েছিল।
চাঁদ হেসে মেয়েকে বলল-
'ভয় কিরে মেয়ে
আমার চোখে-ঠোঁটে রক্ত লেগে নেই
ঈদ হোক কী পূর্ণিমা
আমি সবেতেই আলোকিত রোশনাই।'

বদলানো প্রতিচ্ছবি
সঙ্গীতা ব্যানার্জী

আমার পোষাকী চোখে বসন্তের বাস
রাজ করা প্রতিটি নিউক্লিওসাইডে উত্তেজনা জমায় আমার আন্তরিক ভূমিকম্প
ক্ষয়ে যাওয়া চাঁদ কোলে আগলাই রাতজাগা ব্যক্তিত্ব
হতাশা নৈরাস্যতার রাজনীতি ভেদ করে মন চলে শৈশবের তারুণ্য খুজতে।
আমার পয়মন্ত শুঁয়োপোকারা প্রজাপতি হওয়ার স্বপ্নে পরিণত বহমানতায় নিজেকে বিলোয়
তোমার নিস্তব্ধ বারান্দায় রোদ্দুরের দামাল ইচ্ছে গুলো সরলরেখায় উঁকি দেয়
রং চটা জিনসের প্যান্টের একঘেয়েমি বিবর্ণতায় একবিঘা সাবেকিয়ানা মৃত স্বপ্নের বুক জুড়ে চারা ফোটায়
আমি হেটেরোস্ফিয়ারে বৃথা মাপি মহাসাগরের বৃহৎ গভীরতা তোমার সাহচর্য পেতে
অভিজ্ঞতার সূক্ষ্মকোণ নতুন সূর্যের আহ্বানে জড়সড় অনুভূতি পেরিয়ে তানপুরায় নতুন সুরার উৎপত্তি শোনায়
ক্লান্তির আকাশ ঝলমল নীলের প্লাবনে প্রতিশব্দ বোনে
তৈরী হয় অব্যক্ত ভালোবাসার হেরিটেজ
তার আঙিনায় এক্কা দোক্কা খেলে মৃদু হাসনুহানা
আমরা বদল করি আরেকটু কোমল শিরদাঁড়া।

সম্মোহিত
শ্রীধর

প্রজন্ম নির্বিকার হয়ে খুঁজে চলে,
দীর্ঘশ্বাসে থাকে তার নীরবতা,
দিগন্ত অনতিক্রম্য জেনেও, নেই দোদুল্যমানতা,
আলোর প্রাপ্তিতেই তার প্রসন্নতা।

নির্বিকার রাতগুলোর সাক্ষী থেকে,
সন্ধিক্ষণের অপেক্ষা করে,
বিস্মৃতির অন্তরালে থাকা আস্তরনগুলো,
রামধনুর আলোয় যায় সরে।

সম্মোহিত মনের অজানা পথগুলো,
উৎকণ্ঠার কালোজলে হয় নিমজ্জিত,
বৈতরণী পার হওয়ার অদম্য প্রচেষ্টা,
চলমান দেহে থাকে অবিরত।

তবু এসো পথ ভুলে
গৌতম ঘোষ-দস্তিদার

জানা নেই আর কতগুলো রণ জীবনে দেখতে হবে
পাগলের আঁকা ভূগোলকে নিয়ে লাগবে বিবাদ
আরো কতগুলো নিষ্পাপ হাসি বাষ্প হয়ে যাবে
নবোঢ়া সিঁদুরে নদীটার বুকে ভাসে লাশ নির্বিবাদ

জানিনা যে কেন দেখে যেতে হবে অস্ত্রাগারের বড়াই
প্রকাশ্য দিনে নাচে রাজপথে উলঙ্গ সভ্যতা
জানিনা এখনো ক্ষেপাগুলো কেন মানুষকে করে জবাই
আমাদের পাতে নুন আর ভাতে ; খুনির বাড়ে ভাতা

ভেবে দেখ মাগো একবার আরো এবার আসার আগে
কী লাভ তোমার খেয়োখেয়ি দেখে, লজ্জা শিকেয় তুলে
রাত বেড়ে চলে এখন এখানে দিন ডোবে আগেভাগে
মেঘ করে আসা চোখের পাতায় তবু এসো পথ ভুলে

এসো,কবিতা লিখি
বিদ্যুৎ ভৌমিক

এসো,এবার ছিলাটান অভিমানের কবিতা লিখি
এসো, চটুল ছন্দে কবিতায় আবেগের রং বদলে দিই
অনেক তো হোলো ধুমধড়াক প্রেম পিরীতি তুই তোকারি
অশুভ ইঙ্গিতময় প্রশ্নমালা এবং কুক্রিয় ঘর গেরস্থালি নিয়ে চিল-চিৎকার,
মিথ্যাচার এ সব আর কবিতায় লেখালিখি নয়
এবার অনুভূতিপ্রবণ উচ্চারণ করি যার কাছে যৌবনবোধও হবে ঋণী
অই সেই ‘লাজ রাখো ‘র ন্যাংটো সংস্কৃতি বেলেল্লাপনা যা এতদিন
মানুষকে বেপথু করেছে অকপটে ভুল উচ্চারণ শিখিয়েছে ছল চাতুরীপনায়
যার মধ্যে ছিল নষ্টামির ছাপ, ভুলভাল স্বরলিপি
এবার এসো, সমূহ অসভ্যতা ভুলে সঠিক মন্ত্র উচ্চারণে
আমাদের লজ্জা দ্বিধা টুকুন ঢেকে রেখে অতি দ্রুত সুস্থ সংস্কৃতির
নোতুন পোষাক পালটে ফেলি
তারপর অভিমানী কবিতার প্রণয়ে নিজে আবদ্ধ হই।।

ধুলোমাটির জীবন
তুষার ভট্টাচার্য

একটি জীবন খুঁজি
নদীর ঢেউ কল্লোলে
চাঁদের জোছনা বনে খুঁজি
একটি শ্রীময়ী মুখ ;
একটি জীবন কাটাতে চাই
ভোরের রুপোলি রোদ্দুরে ;
একটি ধুলোমাটির জীবন কাটাতে চাই
শ্রীময়ীর সাথে ঘরবেঁধে
ভালবাসার পর্ণকুটিরে।

গ্রীষ্মের দুপুরে

বিপদতারণ চৌধুরী

গ্রীষ্মকালে রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ,
কাচাঁ আমটি খেতে মজা।
ঘাম ঝরছে চলতে গেলে,
দাঁড়াই গিয়ে গাছের তলে।

খানিক বাদে ফের হাঁটুনি,
হচ্ছে বড়ো খাট-খাটুনি ।
পাচ্ছে খুবই জল পিপাসা,
খেলাম দুটি ফুটি শসা।

পৌঁছে গেলাম একটু পরে
ছোট্ট একটা নদীর ধারে।
জল নেইকো শুধুই বালি
করছে সেথা ধূ ধূ খালি।

যাচ্ছে দেখা একটু দূরে
ওই তো মোদের ছোট্ট কুঁড়ে।
তাড়াতাড়ি সেথায় গিয়ে
ঠান্ডা জলে নেব নেয়ে ।

মায়ের সাথে ওই কুঁড়েতে
খাবো খাবার আসন পেতে।
হাত -পাখাটি ঘোরাবে মা,
সেই বাতাসে জুড়াবে গা।

সবটা আসলে ভালোই হয়েছে

অমিত কুমার গোস্বামী

এই হয়তো ভালো হয়েছে।
পুকুর পাড়ে দুপুরের এঁটো বাসন ধুয়ে নিয়ে গেছে শেষ বউটি।
সারাটা সকাল ডুবসাঁতারে ক্লান্ত পানকৌড়ি জলের ধারে বিশ্রাম নিয়ে নেয়।
ধান কেটে ফেলা খালি মাঠ শিরশিরে বাতাসের ঠান্ডা মাখছে।
একটা কোকিল অন্য বাসাতে ডিম পেড়ে,
চোখ মুছতে মুছতে উড়ে গেল।
বুধনদের বাড়ির বুড়িটার তীব্র শ্বাসকষ্ট।
মন্দিরের ঘন্টা পড়ে থাকে একপাশে, দেবতা শয়নের পর।
কোন কুলুঙ্গিতে তার থাকার কথা, কেউ জানেনা।
জানবার দরকারও তেমন নেই।
কোলাহল একটি বাড়ি বদলে চলে গেছে অন্য বাড়ি।
সেখানেই হয়ত ভাল আছে সে।
এবাড়িতে নিস্তব্ধতা বাস করে।
ঋতুরা যায় আসে।
তবে কালবৈশাখী কখোনো আসেনা।
তাকে বসিয়ে জল দেবে এমন কেউ নেই।
এইসবই আসলে ভালোই হয়েছে।

হবে যে মরণ

কাশীনাথ মোদক

সন্ত্রাস দিয়ে যায়না ছোঁয়া
ভারত বর্ষের মন
এ দেশ বীরাঙ্গনার দেশ
হও আপন জন।
অসুর ধ্বংশে মাতৃ আরাধনা
সিঁদুর দিয়ে নিধন
বিশ্ব বাসি দেখলো চোখে
সেই সে শুভক্ষণ।
জাত ধর্ম তুচ্ছ এসব
আছে রে প্রেম ধন
অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়বো
জঙ্গি কান পেতে শোন ।
ভোল এবার হিংসা ভোল
সন্ত্রাস কর দমন
তা নাহলে কালাকালের
হাতে হবে যে মরণ।।

বায়না

সজল চক্রবর্তী

গরমকাল'টা ঠিক ভালো নয়
ভালোবাসা'র জন্য,
তাই তোকে বলিনা কখনো
এখানে আসার জন্য।

জীবনে রং লেগে যায়
এই বিষ্টি-ভেজা দিনে।
সত্যি ক'রে বল্ তো আমায়,
তুই কি আর আসবিনে ?

বোশেখ গেছে,জোষ্ঠি গেল
এসেছে আষাঢ়--
এই সময়'টা জেনে রাখ তুই
সত্যিই ভালোবাসা'র !

বর্ষা'য় যদি না আসিস
দুর্গাপূজা'য় আয় না!--
জানিয়ে রাখি এই কলমে,
দুষ্টু মনের বায়না।

ভয়
তরুন কুন্ডু

নিশি রাতে অলীক স্বপ্নেরা ক্রমশ কুয়াশায় ঢেকে যায়
হিংসা জয় করে এগিয়ে যায় আদিম মানুষের দল
শ্যামল বৃক্ষের পাদদেশে হাঁটু গেঁড়ে বসে বসে
শুধু রক্তপাত আর স্বপ্ন দগ্ধ তান্ডব নৃত্য দেখে
নিঝুম আলোকিত চাঁদের আলোয়, ঘুম হীন চোখে
যন্ত্রণায় তলিয়ে যেতে আমার খুব ভয় করে
আমি ভেসে বেড়াই সদ্য ফোঁটা ফুল হাতে
ধূসর পতাকার রং নীল,লাল, সবুজ, না হলুদ
এই কথা ভাবতে ভাবতে বিচ্ছেদের যবনিকা নামে
আমার এই ছোট্ট জীবন শৈলীর গোপন গহ্বরে
বিষাদ পর্ব চৌরাস্তার মোড়ে লাঠি হাতে দাঁড়িয়ে
বর্ণময় নাগরিকের পদধূলি আঁকড়ে ধরি একান্তে
রাতের শালবনে একরাশ স্বপ্নের গভীরে হামলে পড়ে
লুকিয়ে থাকা ছদ্মবেশী সহস্র আততায়ীর দল
সময়ের প্রাসঙ্গিক সন্ধিক্ষণে ভেসে বেড়াই অন্ধের মতো
সারা রাতের অন্তিম লগ্নের বিষাদ পর্বে খুঁজে বেড়াই
অন্ধকারে লুকিয়ে থাকা আলোর বিচ্ছুরণের যুপ কাষ্ঠে
দীর্ঘ শূন্যতার দিগন্ত রেখার হাহাকারের প্রতিধ্বনি।

আমার আর্তি
কার্তিক পাত্র

ভোরের নিঝুমতা কাটিয়ে
উঠে উঠেছে নতুন ভোরের আলো
একটা ছোট্ট কথা কলি হেঁটে আসছে
কাশের বন পেরিয়ে।
ধুলোজমা জানালার কাঁচটা মুছতেই
এখন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি
শরতের শুভ্র মেঘের ফাঁক পেরিয়ে
সূর্যের লালাভ আলো ছড়িয়ে পড়েছে প্রশান্তি ভরা মুখে।
এক গোছা লাল শতদল
আলিঙ্গনাবদ্ধ বক্ষ মাঝারে
ছোট উমা রূপে এসেছো কেন
এই অশুভ ধরাতলে।
তোমাকে অন্য রূপে দেখতে চাই মাগো
অসুদলনীর মতো রুদ্র রূপে
পাপের বিনাশ ঘটিয়ে
শান্তি ফেরাও পৃথিবীর বুকে।

দীপাবলী
অভিজিৎ পাত্র

কেউ বলে ফিরিয়েছে মুখ
তবে চিন্তন মনে
টাকা পুড়লে কারো বাড়ি চলে
জোটে আহার বস্ত্র
এক মুখ হাসি
এখনও বা কারো ঘরে
ঘুটঘুটে অন্ধকার
আঁখি ছল্ ছল্!
ছোট্ট দীপু টা খুব কাশে বাজির ধোঁয়ায়
যতো রাত হয় বাড়ে না কি
অমাবস্যার আকাশের দিকে চেয়ে থাকে
মহীনদের তেতলায় ঝোলে
নীল-লাল কত রকম আলো
আমরা ওরকম আলো কিনবো না
তাকিয়ে মা'র দিকে
ওদের মাটির ঘরে
রোদ পড়ে না ভালো
কেরোসিন তেল এর সোঁদা গন্ধ বেরোয়
ঊর্ধ্বমুখী দামের তা ,টান পড়েছে
মা দীপাবলী কি ?
আমার নাম দীপক কেন ?
সময় পেলে বলি ক্ষণ
তুই আর ও বড় হ...বুঝবি
আমার তো কদিন পর জন্মদিন....
চ চ মেলা বকিস না
হ্যারিকেনে আর একটু দম দাও না ''মা''
ওরে তেল খাবে বেশি পুরানো তো !
হঠাৎই ডাক....
ও নীরু,ছেলেটাকে পাঠাবে দুটো প্রদীপ জ্বালবে গো।

কালের প্রতিধ্বনি
তীর্থঙ্কর সুমিত

ভাবছি আবার একটা গল্প লেখা শুরু করবো
যে গল্পে পথের বয়স থেমে থাকবে
ক্রমশ হাসবে নুড়ি - পাথর আর পথের ধুলো
খবরের কাগজের পাতায় ফুটে উঠবে
কালের প্রতিধ্বনি...
ব্যর্থ বিন্দুরা জেগে থাকবে বৃত্তের ভেতর
নির্মল ঝিলে উঁকি দেবে স্বাধীনতার মহামন্ত্র
ছায়াপথের ছায়ায় নিজেকে ঢেকে নেবো আঁচল দিয়ে
তারপর, এক - একটা দিন
আকাশে ঘুড়ি উড়বে আর নীলকে নীল হতে দেখবো প্রখর আদ্রতায়..

স্মরণে পহেলগাম
সিদ্ধেশ্বর দত্ত

সেদিনও আকাশে ঝলমলে রোদ, মিষ্টি হিমেল হাওয়া
সবুজ গালিচা, পাইনের বনে পাখিদের গান গাওয়া।
আবালবৃদ্ধবনিতার দল মেতেছিল উল্লাসে
কেউ নাচে কেউ সুর তাল গানে, মনোরম ছবি ভাসে।
বৈশরনের নীল নীলিমায় মধ্যগগনে রবি
হরেক পোশাকে বিবিধের মাঝে মহামিলনের ছবি!
সহসা সেথায় কিছু শয়তান নরখাদকদের দল
মানুষের রূপে ঘৃণিত পশুরা, হিংসাই সম্বল!
ভীরু কাপুরুষ নরপিশাচেরা আগ্নেয়াস্ত্র হাতে
রক্তে রাঙালো সবুজ গালিচা নির্মমতার সাথে!
ঝরে গেল প্রাণ থেমে গেল গান জীবনের উল্লাস,
মৃত্যু মিছিলে হাহাকার রব ত্রাহি ত্রাহি শুধু ত্রাস!
অসহায় মুখ বোবা কান্নায় শুধায় আর্তনাদে
কেন এ রক্ত কেন এ মৃত্যু কার কোন্ অপরাধে!
শুধু প্রাণ কেড়ে ধর্ম বিচারে ভেবেছে আঘাত হানি'-
ভারতবর্ষে জ্বালাবে আগুন বিভেদের রেখা টানি!
সমগ্র দেশ হলো উত্তাল শত্রুর হোক নাশ
যারা নির্মম নিষ্ঠুর চাই তাদের সর্ব নাশ।
চাই প্রতিশোধ উঠলো আওয়াজ ঐক্যের দেশবাসী
বজ্র কঠিন দৃপ্ত শপথে দাঁড়ালো সকলে আসি।
বহু পরাজয়ে হয়নি শিক্ষা যায়নি পাশব স্বভাব
আমাদের বীর জওয়ানেরা তাই দিলো যে কঠিন জবাব।
জয়ের কেতন ওড়ালো আবার তেরঙা পতাকা তুলে
শুভেচ্ছা তাই হে বীর সেনানী জানাই মালায় ফুলে।
আমরা লিখেছি জয়ের কাব্য শত্রু-শোনিত ধারায়
করেছি ধ্বংস পশুর বংশ ললাট সিঁদুর কাড়ায়।
আমরা হেনেছি আগুন আঘাত মেনেছে শত্রু হার
অনল দহনে জ্বলে পুড়ে খাক ছারখার একাকার।
আমরা মুছব পৃথিবীর বুকে ঘাতক পিশাচ নাম
সকল শহীদে জানাই প্রণাম স্মরণে পহেলগাম

ভাস্তাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত

(ধনিয়াখালি পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত)

▸ অরণ্য সপ্তাহ ▸ কন্যাশ্রী প্রকল্প ঃ মুখ্যমন্ত্রীর স্বপ্নের কন্যাশ্রী প্রকল্প এখন বিশ্বে সমাদৃত ▸ স্বাক্ষরতা ঃ স্বাক্ষরতার মাধ্যমে সার্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা ▸ কমপিউটার প্রশিক্ষণ ঃ কমপিউটার প্রশিক্ষণের মাধ্যমে স্বনির্ভরতা ▸ বিনা ব্যয়ে চিকিৎসা ঃ তৃণমূল স্তরে স্বাস্থ্য পরিষেবা ▸ বিশুদ্ধ পানীয় নলকূপ ঃ নিরাপদ জলপান, করবে সুস্থ জীবন দান ▸ বিপর্যয় মোকাবিলা ঃ পঞ্চায়েত আপনার পাশে ▸ ঢালাই রাস্তা ও মোরাম রাস্তা ঃ গ্রামীণ যোগাযোগের উন্নতি ▸ দুয়ারে সরকার প্রকল্পকে সফল করা

লক্ষ্মীর ভাণ্ডার

WBeDistrict.Com
আমাদের পাড়া
আমাদের সমাধান
AMADER PARA, AMADER SAMADHAN
Standard Operating Procedure

মাটির কাছে চাষীর পাশে
কৃষকবন্ধু

সীতা সরেন হাঁসদা
উপ প্রধান

জয়ন্ত পাত্র
প্রধান

জামালপুর পঞ্চায়েত সমিতি

জামালপুর পূর্ব বর্ধমান

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যাবতীয় প্রকল্প সার্থকভাবে রূপায়ন করে চলেছে জামালপুর পঞ্চায়েত সমিতি। সর্বদা মানুষের পাশে থাকার অঙ্গীকার করে—

জামালপুর পঞ্চায়েত সমিতি

উন্নয়নের সাথে,উন্নয়নের পাশে

পার্থসারথী দে	**ভুতনাথ মালিক**	**পূর্ণিমা মালিক**
সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক	সহ-সভাপতি	সভাপতি

ধনিয়াখালি ২ গ্রাম পঞ্চায়েত

(ধনিয়াখালি পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত)

শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পানীয় জল ও স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী এবং জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান কর্মসূচীর মধ্য দিয়ে স্থায়ী মানবসম্পদ সৃষ্টি, মানুষের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ, ডেঙ্গু রোগ প্রতিরোধ, ম্যালেরিয়া রোগ প্রতিরোধ, সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা, কৃষি শ্রমিক ও অসংগঠিত শ্রমিকদের বীমা কর্মসূচীর

মাধ্যমে মানুষের চাহিদা পূরণে পঞ্চায়েত অঙ্গীকার বদ্ধ। দুয়ারে সরকার কর্মসূচীর সফল রূপায়ণ।

মোম সিদ্ধান্ত
উপ প্রধান

সন্দীপ টুডু
প্রধান

আবুজহাটি ১ গ্রাম পঞ্চায়েত

(জামালপুর পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত)

উন্নয়নের সাথে, উন্নয়নের পাশে

রমজান শা
প্রধান

দশঘরা (২) গ্রাম পঞ্চায়েত

(ধনিয়াখালি পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত)

উন্নয়নের সাথে,উন্নয়নের পাশে

১।নারী শিক্ষার দিশা হল কন্যাশ্রী।এটি একটি আর্থিক উৎসাহদান প্রকল্প, যা আজ সারা বিশ্বে সম্মানিত। ২। বাল্যবিবাহ রোধ করে কন্যাশ্রী। ৩। দরিদ্র মেয়েদের পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়া এবং উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে সাহায্য করে কন্যাশ্রী। ৪। প্রতিটি পরিবারে শৌচাগার মহিলাদের নিরাপত্তার প্রতীক। ৫। আসুনশৌচাগার গড়ি, মনের সুখে ব্যবহার করি। ৬। বিলাব কেন মা বোনের মান, রাখব ধরে ঘরে নারীর সম্মান।

সাবিনা খাতুন
প্রধান

বেলমুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত

(ধনিয়াখালি পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত)

উন্নয়নের সাথে,উন্নয়নের পাশে

নারী শিক্ষার দিশা কন্যাশ্রী আজ সারা বিশ্বে সমাদৃত।
একটি আর্থিক উৎসাহদান প্রকল্প হল কন্যাশ্রী। বাল্যবিবাহ রোধ করে কন্যাশ্রী।
দরিদ্র মেয়েদের পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়া এবং উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে সাহায্য করে কন্যাশ্রী।

আমাদের লক্ষ্য ঃ-

১। নির্মল পঞ্চায়েত গড়ার লক্ষ্যে প্রত্যেক বাড়িতে শৌচাগারের ব্যবস্থা করা।
২। জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা আইনের সুষ্ঠু বন্দোবস্ত করা।
৩। গৃহহীন পরিবার গুলিকে গৃহ নির্মাণের ব্যবস্থা করা।
৪। পরিশ্রুত পানীয় জলের পর্যাপ্ত যোগান।
৫। বৃক্ষরোপণ ও কেঁচো সার ব্যবহারে উৎসাহ প্রদান করা।
৬। জব কার্ড হোল্ডারদের কাজের ব্যবস্থা।
৭। দরিদ্র ও পিছিয়ে পড়া মানুষদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা।
৮। কর্মসংস্থানমুখী স্বনিযুক্তি প্রকল্পে বেকার যুবকদের ঋণের ব্যবস্থা করা।
৯। ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ব্যাপক প্রসার ঘটানো।
১০। দুয়ারে সরকার কর্মসূচীকে সফল করে তোলা।
১১। পাড়ায় পাড়ায় সমাধান প্রকল্পের সফল রূপায়ন।

সর্বোপরি মানুষের সাথে মানুষের পাশে সর্বক্ষণ বেলমুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত অঙ্গীকার বদ্ধ।

নারায়ণ মোদক
উপ প্রধান

অসিত মুদি
প্রধান

গুড়াপ গ্রাম পঞ্চায়েত

(ধনিয়াখালি পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত)

উন্নয়নের সাথে,উন্নয়নের পাশে

শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিশুদ্ধ পানীয় জল ও প্রতিটি গৃহহীন পরিবারের জন্য বাসস্থানের ও বিজ্ঞান সম্মত শৌচাগারের ব্যবস্থা করাই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য। দুয়ারে সরকার ও লক্ষ্মীর ভান্ডার কর্মসূচী বাস্তবায়নে এই গ্রাম পঞ্চায়েত অঙ্গীকারবদ্ধ।

মহঃ সাদিক
উপ প্রধান

দণ্ডীচরণ ঘোষ
প্রধান

গুড়বাড়ী ২ গ্রাম পঞ্চায়েত

(ধনিয়াখালি পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত)

উন্নয়নের সাথে, উন্নয়নের পাশে

আমাদের লক্ষ্য—

১। সার্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা, ২। শিক্ষাশ্রী প্রকল্পে সফলতা, ৩। তৃণমূল স্তরে স্বাস্থ্য পরিষেবা, ৪। সুসংহত শিশু বিকাশ, ৫। ঘরে ঘরে শৌচাগার, ৬। সকলের জন্য নিরাপদ পাণীয় জলের ব্যবস্থা ও স্থায়ী সম্পদ সৃষ্টি করা ৭। কন্যাশ্রী, স্বাস্থ্যসাথী এবং সবুজ সাথীর মতো প্রকল্পগুলি উপভোক্তাদের কাছে পৌছে দেওয়ার সহযোগিতা করা, ৮। নির্মল বাংলা গড়তে সকলের সহযোগিতা কামনা করি।

কৌশিক ঘোষ
উপপ্রধান
গুড়বাড়ী ২ গ্রাম পঞ্চায়েত

চন্দনা মালিক
প্রধান
গুড়বাড়ী ২ গ্রাম পঞ্চায়েত

সৌমেন ঘোষ

সভাপতি

ধনিয়াখালি ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস

সহ-সভাপতি - ধনিয়াখালি পঞ্চায়েত সমিতি

Owner, Publisher & Printer- Israil Mallick, Published from Vill- Mathurapur, P.O- Shiptai, PS- Jamalpur Dist- Purba Bardhaman Pin- 712308 State- West Bengal
Printed at- Two Star Offset Press, 27No. Laskardighi West (Near Rongtuligoli), Burdwan Pin- 713101
Editor- Israil Mallick, Mob- 9434566498 Email- khaborsojasuji@gmail.com